সুজাতা

সুবোধ ঘোষ

কলিকাতা প্রকাশন
৩৪ বি, আনন্দ পালিত রোড
কলিকাতা-১৪

প্রকাশকাল : শ্রাবণ ১৩৬৩
পঞ্চম মুদ্রণ : মাঘ ১৩৬৫

প্রকাশিকা : দীপালী সেন
কলিকাতা প্রকাশন
৩৪বি, আনন্দ পালিত রোড,
কলিকাতা—১৪

পরিবেশক : ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—শ্রী ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা—৪

প্রচ্ছদ মুদ্রক
দি নিউ প্রাইমা প্রেস

॥ আড়াই টাকা

'সুজাতা' কাহিনীর সঙ্গে লেখকের অন্য একটি রচনার, 'আত্মজা' নামের একটি গল্পের মিল আছে। শুধু বক্তব্যের মিল। আর সব বিষয়ে 'সুজাতা' বস্তুত নতুন করে লেখা ছোট উপন্যাস, যদিও বর্ণনার রীতি সাধারণ রীতি হ'তে ভিন্নতর। খণ্ড খণ্ড ও ছোট-ছোট চিত্রপটের মত ঘটনার রূপ পর পর সাজিয়ে কাহিনীটিকে সরলভাবে ও অল্প কথায় পরিবেশন করা হয়েছে।

লেখক

এই লেখকের

ভা র ত প্রে ম ক

শালবনে ঘেরা এই ছোট শহরের কিনারায় ঐ শান্ত বাংলো বাড়িটার নীরব বাতাস আজকাল যখন তখন গুনগুন ক'রে ওঠে। গুনগুন করে একটা দোলনা-দোলানো আর ঘুম-পাড়ানো গান। কখনো আয়া, আর কখনো বা স্বয়ং চারুই গান করে।

প্রায় এক বছর হলো, একটি দোলনা দুলছে এই বাড়ির ভিতরে। চারুর মনের এতদিনের একটা স্বপ্নই যেন সত্য হয়েছে।

বিয়ের পর প্রায় দশটা বছর ধরে শুধু বই পড়ে পড়ে, কাঁটা-কুরুশ নেড়েচেড়ে, সিল্কের আর উলের ফুল তুলে তুলে, আর বাংলোর লনে মরশুমি ফুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে যেন হাঁপিয়ে পড়েছিল জীবন। তার পরেই এক নতুন বেদনায় চারুর চোখ দুটিকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে যেদিন একটা নতুন প্রাণের কান্না বেজে উঠলো চারুর বুকের কাছে, সেদিন যেন নতুন ক'রে হেসে উঠলো চারুর ঐ হাঁপিয়ে-পড়া জীবন।

যে চারু যখন-তখন এই বাংলো বাড়ির নিভৃতে যে-কোন একটা সোফায় ঘুমিয়ে পড়তো, ঘুমোতে এত ভালবাসতো যে চারু, সেই চারুই এখন যেন সারাটা রাত জেগে থাকতে ভালবাসে। কারণে অকারণে আর যখন-তখন ছোট্ট একটি এক বছর বয়সের মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালই লাগে চারুর। ব্যাপার দেখে হেসে ফেলে উপেন। ঘুম ভাঙালে এত রাগ করতো যে ঘুম-কাতুরে চারু, সে আজ কেমন জব্দ হয়েছে।

চারুও বলতে ছাড়ে না।—মশাই বা কি কম জব্দ হয়েছেন।

উপেন বলে—আমার জব্দের কি দেখলে ?

চারু—অফিস থেকে আর ক্যাম্প থেকে এখন সন্ধ্যের আগেই ঘরে ফিরতে হচ্ছে কি না ?

উপেন আর প্রতিবাদ করে না। করতে ইচ্ছাও করে না। চারুই আবার একটা পুরনো অভিমানের জের টেনে হেসে হেসে কথা শোনায়।—যাক্, তবু যে মেয়ের টানে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরছো, এটাও কি আমার কম ভাগ্যির কথা।

উপেন—শুধু কি মেয়ের টানে ?

চারু—রাখুন মশাই, আর কথা বাড়াবেন না। সে-সব কথা কিছুই ভুলি নি। রাত নটা পর্যন্ত অফিসের ফাইল না ঘাঁটলে ঘুম আসতো না যার চোখে, ঘরে যে একটা মানুষ আছে সেকথা ভুলেও একবার ভাবতে পারতো না যে মানুষ···।

উপেন—কিন্তু ন'টা বছর ধরে অফিসে যেতে প্রতি সপ্তাহে পাঁচ দিন আমাকে লেট হতে হয়েছে কেন, কিসের টানে ?

চারুর একটা হাত টেনে ধরতেই উপেনের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে চারু, কিন্তু পারে না। হেসে ফেলে চারু। আজ-কাল এই বাংলো বাড়ির ভিতরে প্রতি সন্ধ্যাতেই এই রকমই মিষ্টি হাসির ঝঙ্কার বেজে ওঠে। দোলনার কাছে এগিয়ে যেয়ে ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে দুজনেই তাকিয়ে থাকে।

এখনো এক বছর বয়স হয় নি, কিন্তু উপেন ও চারুর ভাল-বাসার জীবনের যে স্বপ্ন আজ স্নিগ্ধ সুন্দর ও কোমল একটি ফুলের মতো রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে আর দোলনায় দুলছে, তার একটা নামও দিয়ে ফেলেছে চারু। ওর নাম রমা।

উপেনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা রহস্যের কথা বলতে গিয়ে ঝক্ ক'রে হেসে ওঠে চারুর চোখ।—স্বপ্নের মধ্যেই হঠাৎ ঐ নাম ধরে মেয়েটাকে ডেকে ফেলেছিলাম, তাই।

যখন-তখন দোলনার কাছে এসে ঘুমন্ত রমাকে কোলের উপর তুলে নিয়ে বসে থাকে চারু। রমার গালে গাল ঠেকিয়ে দুর্নিবার এক আদরের আবেশে যেন মুগ্ধ হয়েই ডাকতে থাকে চারু—রমা রমু রম্। রমা, এই ডাকটা যেন চারুর বুকের ভিতর থেকেই

মধুরতার বিহ্বল শোণিতের শিহর হয়ে আপনা থেকেই ভাষা হয়ে ফুটে উঠেছে।

আড়াল থেকে তাকিয়ে দেখতে থাকে উপেন। তার পরেই ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসে হিংসুকের মতো একটা আগ্রহ নিয়ে।

—দাও, দাও; ওকে আমার কাছে দাও। তুমি ঐ সোফায় বসে এখন একটু ঘুমিয়ে নাও।

চারুর হাত থেকে রমাকে তুলে নিয়ে ঘরের ভিতর পায়চারি ক'রে বেড়ায় উপেন।

বৃথাই একটা আয়াকে রাখা হয়েছে। নানা কথার মাঝখানে উপেন হঠাৎ আক্ষেপ করে—তুমিই যদি দিনরাত এটাকে ঘাঁটা-ঘাঁটি করবে, তবে পয়সা খরচ ক'রে আয়া রাখবার দরকার কি?

চারু বলে—ওসব স্টাইল আমার সহ্য হবে না। আয়া রাখবার দরকার নেই। আয়া-ফায়ার হাতে মেয়েকে ছেড়ে দিতে পারবো না।

ঠিক কথা। এক বছরের মধ্যে শুধু মাঝে মাঝে দোলনা দোলানো ছাড়া আয়াকে আর কোন কাজ করতে দেয় নি চারু। আয়ার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। প্রতি মুহূর্তে উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে চারুর অন্তরাত্মা।

উপেন অনুযোগ করলে চারু প্রতিবাদ করে—না, না, এ-কাজ পরকে দিয়ে হয় না।

—কেন?

—কেন আবার কি? নিজের মনের আনন্দকে যেমন পরকে দিয়ে হাসিয়ে নেওয়া যায় না। তোমার পয়সা বাঁচাবার ইচ্ছে থাকলে আয়াকে বিদায় ক'রে দিতে পার।

এই ভাবেই রমা নামে মাত্র এক বছর বয়সের শিশু ঐ মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে এই বাংলো বাড়ির হাসি গান অভিযোগ আর ঝগড়া সবই যেন মিষ্টি সুরে বাজে। ঐ রমারই জন্মদিন দেখা দিল একদিন। শালবনে ঘেরা ছোট শহরের কিনারায় রেল-ইঞ্জিনিয়ার

উপেনের বাংলো বাড়ির লনের উপর উৎসবের আয়োজন রঙীন হয়ে উঠলো।

মাইল পাঁচেক দূরে এক পাহাড়ী নদীর স্রোতের উপর রেলওয়ের জন্য ব্রিজ নির্মাণের পর্ব চলছে এখন। বিকাল হবার আগেই ঘরে ফেরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল উপেন। ক্যাম্পের অফিসের খাতাপত্র সই করে বাইরে এসে দাঁড়ায় উপেন। ওভার্শিয়ার এসে সম্মুখে দাঁড়ায়।

ওভার্শিয়ার খুশী মনে জানায়। সুসংবাদ আছে স্যার।

সুসংবাদ এই যে, কাজ ছেড়ে দিয়ে আর কোন কুলি পালিয়ে যায় নি। কারণ কলেরার ভয় কমে গিয়েছে। ডাক্তার এসে পড়েছে। ওষুধ-পত্র দেওয়া হয়েছে। জল ফিলটার করার ব্যবস্থা হয়েছে। মাত্র দুটো মৃত্যু হয়েছে কাল রাত্রে। আর নতুন ক'রে কোন কেসও হয় নি, মৃত্যুও হয় নি।

খুশী মনে ট্রলির উপর উঠে বসে উপেন। পা চালায় ট্রলিম্যান। ছাতার ছায়ায় বসে উপেন দু'পাশের ফোটা-পলাশের শোভা দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যায়। তার পরেই নিজের হাতের ফাইলের ভিতর থেকে ছোট একটি ফটো বের ক'রে মুগ্ধ চোখের সামনে তুলে ধরে এক বছর বয়সের একটি মেয়ের মুখের ছবি। হেসে ওঠে উপেনের সারা মুখ।

বাংলোর বারান্দায় যখন উপেনের পায়ের শব্দ বেজে উঠলো, তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। লনের উপর টেবিল সাজাতে আরম্ভ করেছে বয় আর বেয়ারা। আর, ঘরের ভিতর আয়ার সঙ্গে চারুর তর্ক চলছে।

আয়া বলে—বেবিকে আমার কাছে এখন দাও মেম সাব। তুমি তোমার কাজ কর।

চারু বলে—আমার আবার কাজ কি এখন ?

আয়া বাইরের বারান্দার দিকে চকিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বলে—শুনতে পাচ্ছ না, সাহেব এসে পড়েছেন।

হ্যাঁ, শুনতে পায় চারু, বারান্দার দিক থেকে উপেনের পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে এই ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে। রমাকে নিয়ে আয়া চলে যেতেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করে উপেন।

গলার টাই-কলার খুলতে খুলতে উপেন একটা ধূর্ত দৃষ্টি তুলে চারুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে—আজ তাহলে তোমার মেয়ের জন্মদিন।

চারু—আজ তোমার মেয়ের জন্মদিন।

উপেন—তার পর ?

চারু—তার পর মানে ?

উপেন—তার মানে আর এক বছর পর ?

চারু—আবার জন্মদিন হবে রমার।

উপেন—আমি জানতে চাই, প্রত্যেক বছর কি শুধু রমারই জন্মদিন হবে ?

চারু ভ্রূকুটি করে—সাবধান।

উপেন—কি ?

চারু—আর নয়। একটিকে নিয়েই মায়ার জ্বালায় মরছি, চোখের ঘুম পর্যন্ত ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে। এই একটিই ভাল। রক্ষে করুন ভগবান, আর চাই না।

গায়ের শার্ট খুলে হুকের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে চারুর মুখের দিকে তাকাতেই চারুর চোখে পড়ে একটি জিনিস। উপেনের কনুইয়ের কাছে সুতো দিয়ে বাঁধা একটি মাদুলি।

চমকে ওঠে চারুর চোখ—সর্বনাশ! ওটা তুমি এখনো পরে রয়েছে ?

ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসে এবং মাদুলিটাকে খুলে ফেলবার জন্য

হাত বাড়ায় চারু, কিন্তু উপেন সরে যায়।—থাক না, তাতে কি হয়েছে ?

চারু—না, আর নয়।

উপেন—কি যে বল ? পিসিমার দেওয়া এমন একটা পয়া জিনিস, গুরুজনের ইচ্ছের অমান্যি করতে নেই। একদিন তুমিই না রাগ করেছিলে, এই মাদুলি পরতে চাই নি বলে ?

চারু—আর রাগ করবো না।

উপেন—কেন ?

চারু—মাদুলির কাজ তো হয়েই গিয়েছে।

উপেন সরে যায়, কিন্তু চারু ছাড়ে না। স্বামী-স্ত্রীতে একটা ধস্তাধস্তির মতই ব্যাপার বেধে ওঠে এই বাংলো বাড়ির এক কক্ষের নিভৃতে।

—না, আর নয়, রক্ষে করুন ভগবান। বলতে বলতে সজোরে উপেনের হাতটা চেপে ধরে মাদুলিটা এক টান দিয়ে খুলে ফেলে চারু, আর ব্লাউজের গলার ফাঁক দিয়ে টুপ ক'রে ফেলে দেয়। সরে যায় চারু।—বেঁচে থাক আমার ঐ একটিই, আর চাই না।

যেন পাল্টা একটা মিষ্টি প্রতিশোধ নেবার জন্য চারুর কাছে এগিয়ে আসতে থাকে উপেন। অকস্মাৎ বাইরের বারান্দায় ধ্বনিত হয় একটা কণ্ঠস্বর। হুজুর !

বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়ায় উপেন। উৎকর্ণ হয়ে শোনে।

আবার ডাক শোনা যায়।—হুজুর।

জানালার কাছে এগিয়ে এসে কৌতূহলের চক্ষু নিয়ে বাইরের বারান্দার দিকে তাকায় উপেন, চারু প্রশ্ন করে—কি ?

উপেন—একটা মেয়ে।

চারু বিস্মিত হয়—মেয়ে ?

উপেন—হ্যাঁ, রমার মতনই।

চারু—তার মানে ?

উপেন—এই এক বছর বয়স, সামান্য কিছু বেশিও হতে পারে, এইটুকু একটা মেয়ে।

বারান্দার প্রান্তে এক কোণে একজন চৌকিদার আর দুজন দীন-দরিদ্র চেহারার কুলি শ্রেণীর মানুষ দাঁড়িয়েছিল। আর, বারান্দায় মেজের ওপর শোয়ানো ছিল এক টুকরো ছেঁড়া কম্বলে জড়ানো দেড় বছর বয়সের একটা ঘুমন্ত মেয়ে।

ধমকের মত কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করে উপেন।—কি চাও?

চৌকিদার—এই মেয়েটার কি হবে হুজুর?

উপেন—তা আমি কি জানি। ওটা কার মেয়ে?

একজন কুলি—আপনার ট্রলি-কুলি বুধনের মেয়ে।

উপেন—বুধন? সেই ভাল্লুকে আঁচড়ানো মুখ, রোগা লোকটা?

কুলি—হুজুর।

উপেন—লোকটা কি পালিয়েছে?

চৌকিদার—মরেছে।

উপেন—অ্যাঁ?

চৌকিদার—লোকটা মরেছে, লোকটার বউটাও মরেছে।

উপেন—কেমন ক'রে?

চৌকিদার—কলেরাতে।

উপেন—কিন্তু, আমার অপরাধটা কি হলো? এখানে ওদের মেয়েকে নিয়ে এসেছ কেন?

চৌকিদার—কোথায়, কার কাছে থাকবে মেয়েটা?

ধমক দেয় উপেন—আমি কি জানি।...যাও যাও। সরে পড়।

মোটর গাড়ির হর্ণ শোনা যায়। রমার জন্মদিনের উৎসবে নিমন্ত্রিতেরা একে একে আসতে আরম্ভ করেছে। উপেন আরও ব্যস্ত হয়ে হাঁক দেয়—যাও যাও, চলে যাও। এখানে এসে গোলমাল করো না।

ব্যস্তভাবে একটা শার্ট গায়ে চড়িয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়

উপেন, উৎসবের আসরে অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করার জন্য। চৌকিদার আর কুলি দুজন কম্বলে জড়ানো শিশুকে নিয়ে লনেরই আর এক প্রান্তের শেষ কোণে এক গাছের তলায় গিয়ে বসে থাকে।

এতক্ষণ ধরে অপলক চোখ নিয়ে আগন্তুক মেয়েটার দিকে দেখছিল চারু। মাঝে মাঝে ছটফট করছিল চোখ দুটো। উপেন চলে যেতেই, কেন যেন ব্যস্তভাবে একবার ডাক দিল চারু—আয়া, আয়া।

আয়া আসতেই আবার বারান্দায় এসে দেখতে পায় চারু, চলে গিয়েছে লোকগুলি।

আয়া প্রশ্ন করে—কি ?

চারু—কিছু না।

আয়ার হাত থেকে রমাকে কোলে নিয়ে লনের উপর সাজানো আসরের দিকে এগিয়ে যায় চারু।

চায়ের আসর। অভ্যাগতেরা রমাকে আদর করলেন। একটা টেবিলের উপর নানা উপহারের একটা স্তূপ তৈরী হয়ে গেল। বয় চা পরিবেশন করে। অভ্যাগতেরা আলাপ করেন।

মাত্র দশ বার জন অভ্যাগত। কতিপয় মহিলাও আছেন। সকলেই সম্পন্ন সমাজের মানুষ। কেউ অফিসার, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ জমিদার। একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, বেশির ভাগ অভ্যাগতেরই সঙ্গে একটি ক'রে কুকুর। কারও কোলের উপর সুন্দর একটি তিব্বতী পুড্‌ল। কেউ বা শিকল ধরে কাছে টেনে রেখেছেন তাঁর প্রিয় হাউণ্ড আর টেরিয়ারকে। কারও স্প্যানিয়েল সামনের দু'পা দিয়ে প্রভুরই গলা জড়িয়ে অনবরত কান দোলায়।

নিজের নিজের কুকুরের প্রতি কার কত মায়া তাই নিয়ে একটা আলোচনার কলরব জাগে আসরে। কার কুকুর কি খেতে

ভালবাসে আর কত বুদ্ধিমান, ব্যাখ্যা ক'রে বলতে থাকেন অভ্যাগতেরা। সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রীতির কাহিনী বর্ণনা করেন এস-ডি-ও চক্রবর্তী। কুকুরের মুখের কাছে একটি বিস্কুট এগিয়ে দেন চক্রবর্তী। কুকুরটা কামড় দিয়ে বিস্কুট ভাঙ্গে। সেই ভাঙ্গা বিস্কুট নিজের মুখেই ফেলে দিয়ে চক্রবর্তী বলেন—আমার টম সারা রাত আমার বুকের উপরেই শুয়ে থাকে। এযে কি মায়া, সেটা আর বুঝিয়ে বলতে পারবো না। আশ্চর্য, কোথা থেকে এরকম মায়া আসে মানুষের মনে ?

আসরের চায়ের টেবিলের কাছে কখনো বসে, আর কখনো ঘুরে বেড়াতে থাকে উপেন আর চারু। এরই মধ্যে হঠাৎ মাঝে মাঝে দুজনেরই চোখের দৃষ্টি ছুটে যায় লনের প্রান্তে একটা গাছতলার দিকে, যেখানে তখনো চুপ ক'রে বসে আছে চৌকিদার, সেই দুজন কুলি, আর ঘাসের উপর শোয়ানো ও কম্বলে জড়ানো সেই শিশু।

মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যায় উপেন আর চারু। একটা অস্বস্তির ভাব হঠাৎ বিচলিত করে চোখের দৃষ্টি। তারপর আবার প্রসন্ন হাস্যে অভ্যাগতদের সঙ্গে আলাপ করে।

বেয়ারাকে কাছে ডেকে উপেন দূরের গাছতলার দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দেয়—ওদের চলে যেতে বল।

চক্রবর্তী প্রশ্ন করেন—কে ওরা ?

উপেন—কোথা থেকে একটা বাচ্চাকে নিয়ে এসে বলছে...।

সাগ্রহে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান চক্রবর্তী—লেপার্ডের বাচ্চা ?

উপেন—না।

চক্রবর্তী—হরিণের ? আমি জীবজন্তুর বাচ্চা বড় ভালবাসি মিস্টার রায়।

উপেন হাসে—না, না, হরিণের বাচ্চা-টাচ্চা নয়।

গাছতলার দিকে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে ব্যস্তভাবে চক্রবর্তী বল্লেন—ভাল্লুকের বাচ্চা বোধহয় !

উপেন মাথা নিয়ে বলেন—মানুষের বাচ্চা।

—মানুষের বাচ্চা! হতাশ হয়ে আর যেন ক্ষুদ্র একটি তুচ্ছতার ধিক্কার ধ্বনিত ক'রে বসে পড়েন চক্রবর্তী।

উৎসবের আসর ভাঙ্গতেই লনের প্রান্তে গাছতলায় বেয়ারার গর্জন শুনে এগিয়ে যায় উপেন আর চারু। উপেন বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট বের করে চৌকিদারকে বলে– এই নাও, আর এই মুহূর্তে ঐ বাচ্চাটাকে নিয়ে চলে যাও।

চৌকিদার বলে—যাব কোথায় হুজুর? এই মেয়েকে এই তল্লাটেই কেউ ঘরে রাখতে রাজী হবে না।

—কেন?

—খুব ছোট জাতের মেয়ে। কাছাকাছি দশ গাঁয়েও ঐ জাতের কোন লোক নেই।

—অন্য গাঁয়ে খোঁজ কর।

—করবো হুজুর, কিন্তু সেই কটা দিন কোথায় থাকবে মেয়েটা?

একজন কুলি বলে—মেয়েটাকে তো শেয়ালে নিয়েই যাচ্ছিল, ভাগ্যিস আমরা হঠাৎ পৌঁছে গেলাম।

চারুর চোখ আতঙ্কে ও বেদনায় শিউরে ওঠে। উপেনও যেন অস্বস্তি আর অপ্রস্তুত অবস্থায় বার বার চারুর মুখের দিকে তাকাতে থাকে।

উপেন আমতা আমতা ক'রে চারুকে উদ্দেশ করেই বলে, যেন একটা পরামর্শ খুঁজছে উপেন—তাহলে···যাকগে ··এসব ঝঞ্ঝাট···কি বল···নিয়েই যাক।

চারু—কিন্তু······কি বলছো তুমি? শেয়ালে নিয়ে যাবে মেয়েটাকে?

উপেন—না, তা বলছি না। কিন্তু···।

চারু ডাক দেয়—আয়া।

উপেন যেন এতক্ষণে সাহস পেয়ে আরও জোর গলায় চেঁচিয়ে ওঠে—আয়া।

আয়া আসতেই চারু বলে—মেয়েটাকে কটা দিন পুষতে পারবে ?

আয়া—পারবো না কেন, আমার কাজই তো তাই।

চারু—তাহলে নিয়ে চল মেয়েটাকে।...গরম জল দিয়ে চান করিয়ে একটা গরম জামা পরিয়ে দাও এখনই।

চৌকিদার ও কুলিরা খুশী হয়ে আভূমি প্রণত হয়ে সেলাম জানায়—সেলাম সাব, সেলাম মেমসাব।

উপেন আর চারু, দুজনেই যদি নিজের নিজের মনটাকে চিনতে পারতো, তবে বোধহয় দুজনে আজই সাবধান হয়ে যেত, এবং অরণ্য শ্বাপদের শাবকের মত অতি ছোট জাতের একটা মেয়েকে এই বাংলো বাড়ির এক নিভৃতে প্রাণবাঁচানো একটা আশ্রয় দিত না। উপেন জানে, চারুও বিশ্বাস করে, এই ঝঞ্ঝাট মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য। তারপর, নিকটে বা দূরের গাঁয়ের ঐ জাতের কোন লোক খুঁজে বের ক'রে মেয়েটাকে তার হাতে গছিয়ে দিতে হবে। তার জন্য হয়তো কিছু টাকা চাইবে লোকটা। নিক না, একশো বা দুশো টাকা নিয়ে কোন জাতের লোক যদি মেয়েটাকে পুষতে নিয়ে যায়, তবে ভালই তো। চৌকিদার বলে গিয়েছে, জাতের লোক খুঁজে আনবে। উপেন বলে দিয়েছে—যত শিগগির পার নিয়ে এসো।

এই বাংলো বাড়ির সীমার মধ্যে একটা মানুষের মেয়ের আবির্ভাবকেও অতি সাধারণ একটা ঘটনা হিসেবেই গ্রহণ করেছে চারু আর উপেন। এই বাড়ির দেয়ালের খোপের মধ্যে যেমন কদিনের জন্য নতুন শালিক এসে ঠাঁই নেয়, আবার কদিন পরেই উধাও হয়ে যায়, তেমনি একটা ঘটনা মাত্র। মেয়েটা আছে,

কদিন পরে কেউ এসে নিয়ে যাবে, বাস্, এর চেয়ে বেশি কিছু চিন্তা করার ব্যাপার এর মধ্যে নেই।

ক্লাবের ঘড়িতে যখন রাত নটার ইঙ্গিত ঢং ক'রে বেজে ওঠে, তখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিলিয়ার্ড খেলার লাঠি থামায় উপেন, আর ঘরে ফিরে যাবার কথা মনে পড়ে।

বাংলো বাড়ির দুই কক্ষে তখন দুটি শিশু-জীবনের ঘুমন্ত রূপ নিঃশব্দে ফুটে রয়েছে। একটি ঘরে চারুর বুকের কাছে ঘুমন্ত রমা, পীযূষভারে কোমল একটি উত্তাপের নীড়ের মধ্যে সুখসুপ্ত হয়ে রয়েছে একটি শিশু মেয়ে। আব, অন্য একটি ঘরে আর একটি শিশু মেয়ে, নতুন বিছানায় একা একা ঘুমোয়, তার তৃষ্ণার্ত অধরের কাছে দুধের বোতল শিথিলভাবে পড়ে রয়েছে। একটি শিশু হলো এই বাড়ির এক দম্পতির শোণিতস্নেহের সৃষ্টি। আর একটি শিশু—দেখে মনে হয়, এই পৃথিবীতে যেন একা একা হঠাৎ চলে চলে এসেছে, এখনো মানুষের কোল পায়নি। বাংলো-বাড়ির দেয়ালঘড়িতে একতারার সুরের টোকার মত রিম-রিম ক'রে সময়ের সঙ্কেত বাজে। চমকে ওঠে চারু, তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গী করে, আর আপন মনেই আক্ষেপ করে—ইস্, ভদ্রলোকের কাণ্ডজ্ঞান আর কোন দিন হবে না। ন'টা বাজলো, এখনো ঘরে ফেরার নাম নেই।

কি যেন মনে পড়ে যায় চারুর। ধীরে ধীরে ওঠে। পা টিপে টিপে এগিয়ে যায়। এই বারান্দা আর ও-বারান্দা পার হয়ে ছোট একটি ঘরের কাছে এসে দাঁড়ায়। দরজায় ঠেলা দেয়। দেখতে পায়, মেজের উপর পড়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে আয়া। তার পরেই ঘরের আর এক প্রান্তে দৃষ্টি ছুটে যয়ে। দেখতে পায়, সদ্য ফোটা ফুলের কুঁড়ির মত একটা ঘুমন্ত মেয়ের মুখ, তার ঠোঁটের কাছ

থেকে সরে গিয়েছে দুধের বোতল। একটা স্নেহশীল শীতল ও কঠিন জড় পদার্থ ঐ বোতলটা।

যেন মনের ভুলেই হঠাৎ দুধের বোতলটাকে মেয়েটার মুখের কাছে এগিয়ে দেবার জন্য হাত তুলে এগিয়ে যায় চারু। কিন্তু ভুল বুঝতে পেরে থমকে দাঁড়ায়। থাক, এতটা [illegible] দরকার নেই। তাছাড়া একটা ছোট জাতের বাচ্চাকে ছোঁয়াছুঁয়ি করারও দরকার মনে পড়ে না। আয়াকেই ডাক দেয় চারু। ঘুম থেকে উঠে আয়াই নিজের হাতে দুধের বোতলটাকে মেয়েটার মুখে ছুঁইয়ে দেয়।

পায়ের শব্দ বাজে বাইরের বারান্দায়। ফিরে এসেছে উপেন। সোফায় বসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে হাঁক দেয় উপেন—সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নাকি এরই মধ্যে!

চারু এসে বলে—কি বললে?

উপেন—মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি?

চারু—রমাও ইঞ্জিনিয়ারিং করে নাকি, যে রাত ন'টা পর্যন্ত জেগে থাকবে?

উপেন—আমি তোমার মেয়েটার কথা জিজ্ঞেসা করছি না। ঐ যে, নতুন একটি অম্বালিকা এসেছে···সেই মেয়েটা।

চমকে উঠে চারু—বেশ তো, মুখে মুখে সুন্দর একটা নামও দিয়ে ফেললে দেখছি।

উপেন—হ্যাঁ, নামটা হঠাৎ মুখে এসে গেল, কি করবো বল? রমার নামটাও তো তুমি হঠাৎ স্বপ্নের মধ্যে বলে ফেলেছিলে, না?

গম্ভীর হয় চারু—হ্যাঁ।

উপেন—কি করছে অম্বালিকা?

চারু—আয়ার ঘরে ঘুমোচ্ছে।

যে পিসিমার দেওয়া মাদুলি নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হাসাহাসির ব্যাপার হয়ে গেল, তিনি হলেন উপেনের দূর সম্পর্কের পিসিমা। শ্যামবাজারে এখনো সেকেলে ঢঙের চক-মিলান যে-সব দালান বাড়ি দেখা যায়, এবং তারই মধ্যে যে-বাড়িটা আজও পুরনো সৌষ্ঠব নিয়ে অটুট হয়ে রয়েছে, সেই বাড়িটা হলো পিসিমার বাড়ি। পিসিমারই সম্পত্তি। সংসারে একটি মাত্র স্নেহের দায় আছে পিসিমার, তার নাম অধীর। পিসিমার নাতি। পিসিমার এক-মাত্র মেয়ের একমাত্র ছেলে। মেয়ে মারা যাবার পর এই নাতিকে কোলে নিয়ে শোক ভুলেছিলেন পিসিমা।

অসুস্থ শরীরে স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্য, অর্থাৎ চিকিৎসকের নির্দেশে হাওয়া বদল করতে মাঝে মাঝে ছোট নাগপুরের শালবনের কোলে ছোট পাহাড়ের গা-ঘেঁষা, সুবর্ণরেখার এক স্রোতের ধারে এই ছোট রেল-টাউনে এসে আত্মীয় উপেনেরই এই বাংলো বাড়িতে থেকে যেতেন পিসিমা। পিসিমা এখানে এসেও নাতির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে মাঝে মাঝে সংসারের মায়ার তত্ত্ব ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতেন। চারুর ছেলে-পিলে হয় না, চারুর সংসারটাকেই তাই বড় মায়াহীন আর শূন্য বলে মনে হয়েছিল পিসিমার। কিন্তু এইবার খুশী হয়েছেন, এতদিনে এই বাড়ির বুকে এক শিশুর কান্নায় সংসারের মায়া জেগে উঠেছে। সার্থক হয়েছে তাঁর মাদুলি।

সেই কবে, মাত্র দু'মাস বয়সের রমাকে আদর ক'রে একদিন চলে গেলেন পিসিমা। যাবার আগে অনেক কথাই বলে গেলেন পিসিমা। কলকাতায় কবে বাড়ি করবে উপেন, কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞসা করেন। সমাজের কথা বলেন, এইটুকু শিশু রমারও ভবিষ্যতের অর্থাৎ বিয়ের কথা বলেন। নিজের বংশগর্বের উল্লেখ ক'রে উপেনকে স্মরণ করিয়ে দেন, রমাকে বড় বংশের ঘরে দিতে হবে। বংশে বড়, বিষয়ে বড়, শিক্ষায় বড়, এমনই একটি ঘরে। পিসিমার কথার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে যেন একটা উদ্দেশ্যের পরিচয়

পাওয়া যায়, এবং মনে হয়, বড় বলতে তিনি তাঁরই ঘরের কথা বলছেন। উপেনের টাকাকড়ি বেশ আছে, পিসিমা ভুলতে পারেন না সেই সত্যও।

কলকাতা থেকে এক বিখ্যাত কথকঠাকুরকে নিয়ে এসে এখানেই এক বছর বয়সে রমার জন্মমাসের সারা মাসটাই বেশ ঘটা ক'রে চণ্ডীপাঠ করাবেন, এই আনন্দের একটা ইচ্ছা জানিয়ে চলে গিয়েছেন পিসিমা। কিন্তু আজও আসতে পারেন নি। মাসটা যে শেষ হতে চললো। কেন এলেন না পিসিমা? তিনি কি আবার বাতের ব্যথায় কাবু হয়ে পড়েছেন? চিঠি দেওয়া হয়েছে পিসিমাকে, কিন্তু সে চিঠির উত্তর আজও এল না কেন?

উপেন আর চারুর চিন্তার প্রশ্নগুলিকে নিশ্চিন্ত ক'রে দিয়ে সেদিনই কলকাতা থেকে সন্ধ্যার ট্রেনে উপস্থিত হলেন সেই বিখ্যাত কথকঠাকুর। গঙ্গাজলে ভরা প্রকাণ্ড একটা তামার কলসী নিজের হাতেই বহন করে স্টেশন থেকে এতটা পথ হেঁটে এসেছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন পিসিমার চিঠি। নাতি অধীরের পরীক্ষা, তাই আসতে পারলেন না পিসিমা।

কথকঠাকুর বললেন—কথকতা আমার পেশা নয়। আমি সত্যিই কথক নই। বলতে পারেন, ধর্মপ্রবক্তা। আমি ইংরাজীর অধ্যাপক। চণ্ডীপাঠ করি নিজের মনের তৃপ্তির জন্য, এবং যারা ধর্মের তত্ত্ব একটু কষ্ট করে বুঝতে চায়; তাদের জন্য। শুনে একটু যেন ঘাবড়েই যায় উপেন, এবং সত্যিই বোকা ছাত্রের মত একটু ভয় পেয়ে বলে ফেলে—নিশ্চয় কষ্ট করে বুঝতে চাই স্যার। থাকুন আপনি, আর যতদিন ইচ্ছে চণ্ডীপাঠ করুন।

অধ্যাপক বলেন—শুনেছি জায়গাটার হাওয়া বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ, অন্তত পনরটা দিন থেকে দেখি শরীরটা একটু···অর্থাৎ চণ্ডীর অন্তত দুটো অধ্যায় সমাপ্ত করার পর···।

কিন্তু কি আশ্চর্য, মাত্র আর একটা ঘণ্টা পরেই দেখতে পায়

উপেন ও চারু, ইংরাজীর অধ্যাপক গঙ্গাজলের সেই প্রকাণ্ড কলসী হাতে নিয়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। উপেন ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে—সে কি? আপনি চলে যাচ্ছেন যে?

অধ্যাপক তাঁর কপালে টোকা দিয়ে বলেন—যাবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু যেতে হলো। আপনার আয়ার কাছে শুনলাম এবং স্বচক্ষেও দেখলাম, আপনি একটা অন্ত্যজের মেয়েকে ঘরে নিয়ে এসে লালন করছেন।

উপেন—আশ্চর্য!

অধ্যাপক—আশ্চর্য হতে নেই উপেনবাবু। ধর্মবিধিতে বলে, অন্ত্যজের স্পর্শই শুধু দোষাবহ নয়, তার সান্নিধ্যও দোষাবহ। শুধু ছোঁয়াছুয়ি নয়, ওসব বস্তু নিকটে রাখাও চলে না। আপনি শিক্ষিত বিদ্বান মানুষ, নিশ্চয় জানেন যে, সায়েন্সেও এই ভয়ের কথা লেখা আছে।

উপেন—কি কথা?

অধ্যাপক—অন্ত্যজ মানুষের শরীর থেকে একরকমের গ্যাস বহির্গত হয়, সে গ্যাস সদ্বংশীয়ের দেহ মন ও আত্মার ক্ষতি সাধন করে।

উপেন—এরকম গ্যাস কি কখনো দেখতে পাওয়া গেছে?

অধ্যাপক—না। আপনি কি কখনো ভাইটামিন দেখেছেন? ভাইটামিন চক্ষে দেখতে পাওয়া যায় কি?

উপেন—না।

অধ্যাপক হাসেন—তাহলে ভাইটামিন কি মিথ্যা?…আচ্ছা, আসি, বিদায় নিতে আজ্ঞা দিন তাহলে।

চলে গেলেন ধর্মপ্রবক্তা অধ্যাপক। চারুর মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হবার চেষ্টা করতে গিয়েই হেসে ফেলে উপেন। কিন্তু চারু হাসতে পারে না। চারু বলে—আমার সত্যিই কেমন ভয় করছে।

উপেন—কিসের ভয়? অস্থির শরীর থেকে যে ভয়ানক গ্যাস বের হয়ে আমাদের দেহ মন ও আত্মার একেবারে…।

চারু—ঠাট্টা ছেড়ে দাও। ভদ্রলোক একটি বেলাও না থেকে, মুখে একটু জলও না দিয়ে চলে গেলেন, এটা কি ভাল হলো?

উপেন—আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর তবে বলবো, খুব ভাল হলো। এই সব গোবর মাখানো সায়েন্সকে যারা বিশ্বাস করে তাদেরই অকল্যাণ হয়। ঐরকম লোকের কাছ থেকে চণ্ডীর ব্যাখ্যা শুনেও কোন কল্যাণ হয় না।

হ্যাঁ, একটা কথা ভাবতে খারাপ লাগছে উপেনের। পিসিমা দুঃখিত হবেন। পিসিমা খুব বেশি রাগ করেও ফেলতে পারেন। যাই হোক, পিসিমার পক্ষে বেশি দিন রাগ ক'রে থাকা সম্ভব হবে না। কারণ, যাকে নিয়ে এই সমস্যা, সে আর এখানে কতদিন?

স্বামী-স্ত্রীতে আলোচনা হয়। একটা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা। এই আলোচনা শুনলে মনে হয় দুটি মানুষ যেন নিজের মনটাকে সন্দেহ করতে পারছে।

উপেন বলে—সমস্যাটা কি জান? কুকুর বেড়ালও দশটা দিন কাছে থাকলে মায়া পড়ে যায়। আর এটা তো হলো মানুষের মেয়ে। ছোট জাতের হোক, আর যারই হোক, একটা মানুষের বাচ্চা তো বটে। বেশিদিন কাছে রাখা উচিত নয়।

চারু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলে—ঠিকই বলেছ। আমি আয়াকে বলে দিয়েছি। মেয়েটাকে দূরে দূরে রাখবে।

উপেন—হ্যাঁ, ওসব জিনিসের সঙ্গে ঘেঁসাঘেসি ছোঁয়াছুয়ি না হওয়াই ভাল।

চারু—জাতটাও তো ভাল নয়।

উপেন—আসল কথা হলো, ছোঁয়াছুঁয়ি হলেই একটা মায়া পড়ে যেতে পারে।

এই আলোচনা শুনলে মনে হয়, নিজের নিজের মনকে চিনতে পেরেছে দুজনেই, তাই আগে থেকেই সাবধান হবার জন্য যেন প্রতিজ্ঞা করছে দুজনে।

আবার স্মরণ করিয়ে দেয় চারু—চৌকিদারকে তাড়া দাও, যেন তাড়াতাড়ি জাতের লোক নিয়ে আসে আর মেয়েটাকে নিয়ে যায়।

কদিন পরের ঘটনাতেই কিন্তু প্রমাণিত হয়ে যায়, নিজের নিজের মনকে চিনতে ভুল করেছে দুজনেই। একটা পরের মেয়ে তাকে ছোঁয়াও উচিত নয়, কারণ ছোঁয়াছুয়ি হলে মায়া পড়ে যেতে পারে। কিন্তু এই মায়া এড়াবার শক্তি দুজনের কার কতখানি আছে, সেটা নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারে নি দুজনের একজনও। এত যুক্তি বুদ্ধি খাটিয়ে যে প্রতিজ্ঞা করলো দুজনে, সেই প্রতিজ্ঞাটাই ঠুনকো কাচের মত ছোট একটি ঘটনায় ভেঙে গেল, আর তার ফল এই হলো যে, দুজনেই দুজনের উপর রাগ ক'রে আর অভিযোগ ক'রে আর একটা সমস্যা সৃষ্টি ক'রে বসলো।

সাতদিনের জন্য দূরের এক লাইন দেখার জন্য সফরে বের হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ার উপেন। ফিরে এসে যখন বাংলো বাড়ির ফটকে প্রবেশ করে উপেন, তখন দেখতে পায়, আয়া একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আয়ার কোলে একটা বাচ্চা মেয়ে।

চেঁচিয়ে ডাক দেয় উপেন—রমা, রম্, রমু। আয়া কাছে আসছে না দেখে হাত তুলে ইঙ্গিতে কাছে আসতে বলে। আয়া কাছে আসতেই উপেনের দুই চক্ষু যেন একটা স্পর্শে হেসে ওঠে—অ্যাঁ, এটা কে রে? এটা সেই অম্বালিকাটা না?

আয়া হাসে। উপেন বলে—ভয়ানক দুষ্টু হবে এই মেয়েটা, দেখছো না কি রকমের চোখ।

বলতে বলতে মেয়েটার গাল টিপে আদর ক'রে ফেলে উপেন—অম্বি·· টাট্ টাট্।

জানালা দিয়ে এই দৃশ্য দেখে ভ্রূকুটি করে চারু। উপেন ঘরে

প্রবেশ করতেই চারু প্রায় একটা ঝগড়ার মত ব্যাপার বাধিয়ে তোলে—তুমি ছুঁলে কেন মেয়েটাকে ?

—তাতে কি হয়েছে ? আমার জাত গিয়েছে ?

—জাত যাবে কেন, কিন্তু নিজের কথাই তো রাখতে পারলে না। আদর করার জন্য তোমার নিজের মেয়ে ঘরে নেই ?

সেই সন্ধ্যাতেই প্রতিশোধ নিল উপেন। হঠাৎ চারুর কাছে ব্যস্তভাবে ছুটে এসে প্রশ্ন করে—থার্মোমিটার আছে ?

—আছে। কেন ?

—মেয়েটার জ্বর এসেছে বোধ হয়।

—কোন্ মেয়েটার ?

—অস্থির। নিশ্চয় সাংঘাতিক জ্বর, বোধ হয় গা পুড়ে যাচ্ছে।

চমকে ওঠে, বিচলিত হয় চারু।—জ্বর কেন হলো। কি আশ্চর্য, ইস, পুড়ে যাবে কেন ? কি যে বলছো, মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

উপেন বলে—মেয়েটার মুখটা দেখলেই বুঝতে পারবে।

আয়াব ঘবের ভিতর এসে ঢোকে চারু। সঙ্গে সঙ্গে উপেনও আসে। কিন্তু হঠাৎ ভুল করলো চারু। অস্থির কপালে হাত দিয়ে বার বার যেন একটা শিশুর অসহায় জীবনের কোমল স্পর্শ অনুভব করে চারু। আশ্চর্য হয়ে বলে—কই, জ্বর বলে তো মনে হচ্ছে না।

সেই মুহূর্তে দেখতে পায় চারু, মুখ টিপে হাসি লুকিয়ে গম্ভীর হবার চেষ্টা করছে উপেন।

উপেন বলে—নিজের কথাই তো রাখতে পারলে না, মেয়েটাকে ছুঁয়ে ফেললে কেন ?

রাগ ক'রে উত্তর দিতে গিয়ে হেসে ফেলে চারু। তারপর আবার শান্ত চিত্তে আর শান্ত স্বরে ছুজনের মধ্যে আলোচনা চলতে থাকে।—আসল কথা কি জান, কাছে রাখলে এরকম ছোয়াছুঁয়ি হবেই, আর···।

উপেন—আর মায়-টায়া পড়বেই।

চারু—কাজেই।

উপেন—কাজেই তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেওয়া ভাল। নিজের মেয়ে নিয়েই উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার তাল সামলাতে পারে না মানুষ, তার ওপর যদি একটা পরের মেয়েকে নিয়ে···নাঃ, আর দেরি করা উচিত না। আর দু'একমাসের মধ্যে মধুপুরে বদলি হতে হবে। তার আগেই মেয়েটাকে ওর একটা জাতের লোকের কাছে···।

পিসিমার চিঠি এসেছে।—সকল ব্যাপার শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। তুমি জান, তুমি কত উচ্চ সদ্বংশের সন্তান। তোমাদের সাতপুরুষে কেহ কুলীন ব্যতীত অন্য কোন নীচ ঘরের সহিত কুটুম্বিতা পর্যন্ত করে নাই। ভাবিয়া পাই না, তুমি কি করিয়া তোমার জাতের উচ্চতা ও শুচিতা ভুলিয়া একটা অন্ত্যজের মেয়েকে ঘরে স্থান দিতে পার। আশা করি, পত্রপাঠ উহাকে বিদায় করিয়া দিবে।

পিসিমার চিঠি পড়ে ক্ষুব্ধ হয় উপেন, কিন্তু পিসিমার উপর ক্ষুব্ধ হতে পারে না। পিসিমা ঐ জাতের বড়াই নিয়েই তাঁর সারা জীবন ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। কলকাতায় যখন কলেজে পড়তো উপেন, তখন প্রতি রবিবার এই পিসিমারই বাড়িতে এসে খেয়ে যেতে হতো। পোলাও থেকে পায়েস, বিশ রকমের খাবার নিজের হাতে রান্না করে উপেনকে খাওয়াতেন এবং খাইয়ে খুশী হতেন পিসিমা।—আমার সব কুটুম্বের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে বড় বংশের ছেলে উপেন। তাই তো তোমাকে সবচেয়ে বেশি স্নেহ করি। পিসিমার স্নেহের কারণটা যাই হোক্, স্নেহটা তো আর মিথ্যা নয়। পিসিমার সম্পর্কে বিশেষ একটা শ্রদ্ধার টান অনুভব করে উপেন। এমন পিসিমা দুঃখিত না হলেই ভাল।

অম্বির কথাটা বার বার ভাবতে হচ্ছে। পিসিমা যাই বলুন, উপেন আর চারু ঠিক জাত বাঁচাবার সমস্যা নিয়ে মনটাকে দুশ্চিন্তায় বিব্রত করছে না। অম্বি নামে ঐ মেয়েটারও যে একটা ভবিষ্যৎ আছে।

মেয়েটার ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে গিয়েই সমস্যাটা অনুমান করতে পারে উপেন আর চারু। এই মেয়েকে তো চিরকাল কাছে রাখা যাবে না। ভিন জাতের আর ছোট জাতের একটা মেয়েকে বড় ক'রে তুললেই আপনজন হয়ে যাবে না মেয়েটা। সমাজ আছে, সমাজের নিয়ম আছে। মেয়েটাকেও ভবিষ্যতে একটা সমস্যায় পড়তে হবে।

কিছুদিন মাত্র কাছে রাখতে হবে, কিন্তু এই কিছুদিনের মধ্যে মেয়েটার উপর যেন মায়া পড়ে না যায়। মাত্র এইটুকু হলো উপেন আর চারুর মনের দাবি।

বদলি হবার দিন যতই এগিয়ে আসে, ততই চৌকিদারকে তাড়া দেয় উপেন। শেষে একদিন, বদলি হবার দুদিন আগে সমস্যা থেকে একেবারে মুক্ত হবার সুযোগ পেয়ে গেল উপেন আর চারু।

বাংলোর বারান্দায় বসে বই পড়ছিল উপেন। দূরে লনের বেড়ার গা ঘেঁসে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আয়া, কোলে অম্বি। হঠাৎ ফটকের কাছে আগন্তুক কয়েকটা মূর্তিকে দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে উপেন। আসছে চৌকিদার, সঙ্গে আরও তিনজন লোক।

চৌকিদারকে দেখতে পেয়েই বিচলিত হয়, আর ছটফট ক'রে বারান্দায় এসে ডাকতে থাকে উপেন।—আয়া আয়া। শিগগির এদিকে চলে এস।

আয়া নিকটে আসে। চৌকিদার এগিয়ে আসছে। উপেন রাগ ক'রে ধমক দেয় আয়াকে—ওখানে ঘুরঘুর করছো কেন? শিগগির ঘরের ভেতর চলে যাও।

আয়া ঘরের ভিতর চলে যাবার পর-মুহূর্তে উপেন যেন সন্ত্রস্তের

মত একলাফে বারান্দা থেকে সরে গিয়ে অন্য ঘরের ভিতর লুকিয়ে পড়ে। বারান্দায় চিৎকারের মত কর্কশ কতগুলি আহ্বানের স্বর বাজতে থাকে—হুজুর, হুজুর।

যেন এই আহ্বানের শব্দগুলি সহ্য করতে গিয়ে আরও বিচলিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছে উপেন। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে জানালার কাছে এসে একবার বাইরে উঁকি দেয়, তারপর জানালা বন্ধ ক'রে দেয়।

চারু এসে বিস্মিত হয়।—এ কি হচ্ছে?

উপেন—ওরা এসে গেছে।

চারু—কারা?

উপেন—ঐ ওরা, অস্থির জাতের লোক।

থরথর ক'রে হঠাৎ কেঁপে ওঠে চারুর দুই চোখের দৃষ্টি।—কই দেখি।

স্বামী আর স্ত্রী একসঙ্গে দৃষ্টি তুলে আবার খোলা জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে বারান্দার দিকে তাকায়।

চৌকিদার বলে—পঞ্চাশটা টাকা, আর কিছু কাপড়-চোপড় ...আর এক আধটা কম্বল...এই পেলেই ওরা মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে পুষতে রাজী আছে হুজুর।

উপেন হতভম্বের মত চারুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—খুব কম টাকাই তো দাবি করেছে, কিন্তু লোকগুলি ভাল কি মন্দ বুঝতে পারছি না।

চারু হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—ঝাঁটা মার...দূর দূর দূর!

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে মারমূর্তি হয়ে বের হয়ে আসে উপেন—ভাগো ভাগো, ভাগো। আগে নিজেরা মানুষ হও, তার পর পরের মেয়েকে মানুষ করতে এস। যত সব ইডিয়ট হামবাগ্!

চৌকিদার ভীতভাবে বলতে থাকে—সেলাম হুজুর, যাচ্ছি হুজুর, ঠিকই বলেছেন হুজুর।

অমানুষগুলিকে তো বিদায় ক'রে দেওয়া হলো, আর হাঁপও ছাড়লো উপেন আর চারু। কিন্তু সমস্যার কথাটা দুজনেই চিন্তা না করে পারে না। এইভাবে যদি মেয়েটাকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা আর চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হয়, তবে কি হবে উপায়?

তাহলে মেয়েটা এই বাড়িরই মেয়ের মত হয়ে উঠবে যে। তখন? তখন যে মেয়েটাই এই বাড়িকে নিজের বাড়ি বলে মনে ক'রে বসবে।

কী জটিল সমস্যা। মেয়েটাকে তখন এই বাড়ি থেকে বিদায় দিলে মেয়েটাই বা সহ্য করবে কেমন ক'রে সেই বিদায়? এখনো কথা বলতে শেখে নি, বোঝেও না কিছু, মাত্র আয়ার কোলই চিনতে পেরেছে। কিন্তু আর একটু যখন বড় হবে, তখন উপেন আর চারুকেও যে আপন জন বলে মনে ক'রে ফেলবে। এইটুকু একটা শিশুর সেই মনের টানকে ছিঁড়ে দিতে পারা যাবে তো।

অনেক আলোচনা আর গবেষণা ক'রে স্বামী-স্ত্রীতে মিলে আর একবার একটা প্রতিজ্ঞা করেন।—না, আর বেশী দেরি করলে চলবে না। মধুপুরে গিয়েই, খোঁজ খবর ক'রে কোন সাধারণ গরীব...এই ধর কোন চাপরাশি বা বেয়ারার ঘরে মেয়েটাকে যদি সঁপে দেওয়া যায়, তবে মন্দ হয় না। ছোট জাতের মেয়েদের তো এই বয়সেই বিয়ে হয়। কিছু টাকা দিলে পাত্র পাওয়া যাবে নিশ্চয়।

নিশ্চয়, আর কোন সন্দেহ থাকে না উপেন আর চারুর মনে। কিন্তু...এইবার থেকে আর একটা বিষয়ে সাবধান হতে হবে। চারু বলে—মেয়েটা যেন কখনই ভাবতে না শেখে যে, আমরা ওর আপনজন। আমাদের জন্য যেন কোন মায়া না জেগে বসে মেয়েটার মনে। তাহলেই কিন্তু সমস্যা জটিল হবে।

অর্থাৎ, এইবার থেকে একটু নির্মম হতে হবে, এই ধরনেরই একটা সিদ্ধান্ত করে উপেন আর চারু।

কাঁদছে অম্বি। অম্বির একটানা একঘেয়ে কান্নার স্বর শোনা যায়। বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় চারু। বারান্দার আর এক প্রান্তের দিকে তাকিয়ে প্রায় চিৎকার করে আয়াকে ধমক দেয় চারু—মেয়েটা এরকম বিশ্রীভাবে কাঁদছে কেন আয়া? দোলনা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

আয়াও চেঁচিয়ে উত্তর দেয়।—দোলনা অনেক দুলিয়েছে।

চারু—তবে কাঁদছে কেন মেয়েটা?

আয়া আরও জোরে চেঁচিয়ে বলতে থাকে—তুমি তো এক মেয়ের মা হয়েছে, তুমি কি জানো না, বাচ্চা মেয়ে কিসকে লিয়ে এমন ক'রে কাঁদে।

যেন এক ছলক করুণ রক্তের আভা হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ে চারুর মুখের উপর। চুপ ক'রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে চারু। মনে হয়, যেন অনেক কষ্টে আর ইচ্ছা ক'রে শরীরটাকে কাঠ ক'রে রাখতে চাইছে। উপেন গম্ভীর ভাবে বলে—শক্ত হতে চেষ্টা করছো বুঝি?

চারু খেঁকিয়ে ওঠে—তুমি অসভ্যতা করো না।

হাসি লুকোতে গিয়ে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় উপেন।

মধুপুরের তিন বছরের জীবন দেখতে দেখতে কেটে গেল। আবার নতুন জায়গায় বদলি হবার সময় এগিয়ে এল। দুজনের মনে হঠাৎ সমস্যাটা আবার দুশ্চিন্তা জাগিয়ে তোলে।

এতদিন যেন মনের ভুলে ভুলেই গিয়েছিল দুজনে। একটা পরের মেয়ে এই ঘরেরই বাতাসে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে। কিন্তু এত দেরি করা উচিত ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মাঝে

মাঝে কথা কাটাকাটি হয়। দুজনেই দুজনের উপর দোষারোপ করে। কথা কাটাকাটির পর আবার দুজনেই শান্তভাবে আলোচনা করে।—মেয়েটারই ওপর অন্যায় করা হচ্ছে। আর দেরি করলে বাড়ির মেয়ের মত হয়ে উঠবে যে। তখন কি হবে উপায়? বিয়ের বয়স যখন হবে, তখন বিয়েই বা হবে কার সঙ্গে? মেয়েটার মন এই বাড়ির মেয়ের মত হয়ে উঠবে, অথচ বিয়ে দিতে হবে একটা ছোট ঘরে। কেমন ক'রে সেই ঘরকে সহ্য করবে মেয়েটা? তার চেয়ে, এখান থেকে যাবার আগে একটা পাত্র-টাত্র খুঁজে বের ক'রে মেয়েটার গতি ক'রে দেওয়া যায় তো ভাল।

ঘরের জানালায় একটা ছোট্ট মেয়ের হাসি-হাসি মুখ ভেসে ওঠে। রমার মুখ। বাইরের ফুলের টবের উপর দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দেয় আর ডাক দেয় রমা—বাবা!

তার পরেই ডাক দেয়—মা।

চারু বলে—দুষ্টুমি করোনা রমা, যাও পুতুল নিয়ে খেলা কর।

ঘরের অন্য একটা জানালায় আর একটা ছোট্ট মেয়ের হাসি হাসি মুখ হঠাৎ ভেসে ওঠে। বাইরের ফুলের টবের উপর দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর উঁকি দিয়েছে অম্বি। উঁকি দিয়েই উপেনের দিকে তাকিয়ে ডাক দেয়—আপ্পি!

তারপর চারুবালার মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক দেয়—আম্মি! দৌড়ে চলে গেল অম্বি।

উপেন আর চারু আলাপ করে—এই ডাকগুলি কি অম্বি আপনা-আপনি শিখলো?

চারু—না, আয়া শিখিয়েছে।

উপেন—যাক্, তবু ভাল, রমার মত বাপ-মা আরম্ভ করলেই হয়েছিল আর কি?

কি আশ্চর্য, এই ধরনেরই এক একটা প্রাচীর তুলে নিজের মেয়ের কাছ থেকে পরের মেয়েকে দূরে সরিয়ে রেখেছে উপেন

আর চারু। অম্বির কাছে তারা হলো আপ্পি আর আম্মি, বাবা আর মা নয়।

কিন্তু যখন রমা আর অম্বির ঝগড়ার ভাষা শুনতে পায়, তখন দুজনেই আবার আশ্চর্য হয়, আর মনের এলোমেলো চিন্তার মধ্যে বুঝতে পারে, এই ব্যবধান যে ব্যবধানই নয়। পৃথিবীতে এক আপ্পি আর এক আম্মিকে পেয়েই ধন্য হয়ে গিয়েছে অম্বি।

রমা অম্বিকে তুচ্ছ ক'রে মুখ বেঁকিয়ে বলে—তোর তো মা নেই।

অম্বি—তোর তো আম্মি নেই।

রমা—তোর তো বাবা নেই।

অম্বি—তোর তো আপ্পি নেই।

উপেন আর চারু দুজনেই একসঙ্গে ধমক দেয়—ওকি হচ্ছে।

ধমক দিয়েই যেন বিমর্ষ হয়ে পড়ে দুজনেই! এত সতর্কতা তবু কোথা থেকে যেন একটা কঠিন বিদ্রূপ চক্রান্ত ক'রে বার বার ভেঙ্গে দিচ্ছে আর ভুয়ো করে দিচ্ছে তাঁদের এই সতর্কতার প্রাচীরকে। অম্বি নামে ঐ পাঁচ বছর বয়সের একটা ভিন্ন রক্তের মেয়ে যেন নিজের মনের অহংকারেই রমার সঙ্গে সমান তাল রেখে এই বাড়ির স্নেহের আঙিনায় ছুটাছুটি করার শক্তি পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাধা দিতে হবে। বাধা দিচ্ছেও উপেন আর চারুবালা। বেশ ভেবে চিন্তে আর ইচ্ছা করে নির্মম হবার চেষ্টা করছে। রমা আব অম্বির মধ্যে আরও শক্ত পাথরের প্রাচীর তৈরি করতে হবে। যেন বুঝতে পারে অম্বি, আপ্পি আর আম্মির গা ঘেঁসে থাকবার অধিকার অম্বির নেই। রমা যা, অম্বি তা নয়। এখন থেকেই ঐটুকু মেয়েকে ওর জীবনের এই কঠোর সত্য বুঝিয়ে দিতে হবে। নইলে সমস্যা বাড়বে।

এরই মধ্যে অনেক খোঁজাখুজির পর অপিসের দারোয়ানের সাহায্যে এক পাত্রের সন্ধান পেল উপেন। রেলের কুলিসর্দারের এক ভাইয়ের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারা যায় অম্বির। পাত্রের

বাপের কিছু ক্ষেত খামার আছে। ছোট জাত। পাত্রের খুড়ো সেই কুলিসর্দারই এসে একদিন উপেনের বাড়ির বারান্দায় উঠলো।

কিন্তু সেইরকম ঘটনা ঘটে গেল আবার। চারুবালা ব্যাপার দেখে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল। তার পরেই চেঁচিয়ে ওঠে চারু—দূর কর, যত সব আপদ!

হঠাৎ বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে উপেন। বেচারা কুলিসর্দারকেই ধমক দেয়—যাও যাও, যাও।

মুখভার ক'রে চুপ করে বসে রইল চারুবালা। যেন দুর্বোধ্য একটা বেদনা বুকের ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে, এবং নিজেরই অদৃষ্টের বিড়ম্বনার দিকে তাকিয়ে ছলছল করে উঠছে তার চোখ। সান্ত্বনার ভঙ্গীতে চারুবালার হাত ধরে উপেন—অকারণে আমার ওপর রাগ করো না লক্ষ্মীটি।

জানালার কাছে ভেসে ওঠে এক জোড়া কৌতূহলী হাসি-হাসি শিশু মুখ! রমা আর অম্বি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কি-যেন শোনে আর কি-যেন ভাবে। তার পরেই জানালা থেকে নেমে চলে যায়।

উপেন বলে—এখন বুঝতে পারছি, এভাবে কিছুই হবে না।

চারু—কি?

উপেন—বাজে লোকের হাতে মেয়েটাকে দিতে পারা যাবে না। আমিও পারবো না, তুমিও পারবে না।

চেঁচিয়ে ওঠে চারু—তাহলে মেয়েটা কি বাড়ির মেয়ের মতোই হয়ে উঠবে না কি?

—না, তা বলছি না। বলছি, যদি ভাল একটা অনাথ আশ্রমে ওকে দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে···।

—তাহলে কি?

—তাহলে আমাদেরও মনে দুঃখ থাকবে না যে মেয়েটার ওপর অন্যায় করা হলো। কারণ, ভাল অনাথ আশ্রমে থাকলে

মেয়েটা লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে একটা ভাল মানুষের সংসার পেয়েই যাবে।

—আছে এরকম আশ্রম?

—আছে নিশ্চয়, খোঁজ নিতে হবে।

—আশ্রম খুঁজতে আবার কতদিন লাগবে, কে জানে?

—না আর দেরি করলে চলবে না। মেয়েটা এরই মধ্যে অনেক ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছে।

—কি করেছে?

—আয়াই বলে, দিনরাত রমার সঙ্গে হিংসেহিংসি করছে রমাকে মারধরও করে অম্বি।

—রমাও তো অম্বিকে মারে।

—কিন্তু রমা তো কোন সমস্যা নয়। রমার ওপর আমাদের যতই মায়া বাড়ুক আর আমাদের ওপর রমার যতই মায়া বাড়ুক না কেন, তাতে তো কোন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে না। কিন্তু অম্বি যদি আমাদের দুজনকে আপনজন ভেবে বসে···।

—ভেবে বসেছে, তোমারই জন্য এসব কাণ্ড হচ্ছে।

রাগ করে উপেন—আমাকে দোষ দিও না, তোমার চেয়ে অনেক বেশি শক্ত মন আমার। আমি আজ পর্যন্ত একটা পুতুলও অম্বির জন্য কিনে আনি নি। তুমিই স্টাইল ক'রে ওর জামার ছাঁট ছেটেছ আর সেলাই করেছ।

হেসে ফেলে চারুবালা—তুমি যত পুতুল রমাকে এনে দিয়েছ, অম্বি সবই কেড়ে নিয়েছে।

—অ্যাঁ, কোন সাহসে কাড়ে?

—ভগবান জানেন।

দূরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় উপেন আর চারুবালা, আয়া একটা নতুন ডল রমার হাতে তুলে দিচ্ছে। অম্বি বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে আয়ার উপর উপদ্রব করছে।

উপেন রাগ ক'রে অম্বির হাত থেকে ডল কাড়বার জন্য যেন একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যায়। চারু-ও সঙ্গে সঙ্গে উপেনের পিছনে হন্ত-দন্ত হয়ে হেঁটে আসতে থাকে। চারু বার বার বাধা দেয়—এটা আবার কিরকম পাগলামি করছো তুমি।

—না আমার কাছে ওসব আবদার নেই, আমি শক্ত মানুষ। তুমিই লাই দিয়ে দিয়ে সমস্যা বাড়িয়েছ।

চারুবালা মুখ টিপে হাসে—ইস্।

থামতে হয় উপেনকে। চারুই উপেনের হাত ধরে উপেনকে থামতে বাধ্য করে। ছেলেমানুষে এরকম ঝগড়া ঝগড়া খেলা খেলেই থাকে, কিন্তু তুমি তার জন্য সত্যিই মাথা খারাপ করছো কেন?

উপেনের রাগটা হঠাৎ অপ্রস্তুত হয় এবং চারুর দিকেই ভ্রূকুটি ক'রে বলে—না, মোটেই খেলা নয়। অম্বির মনে মতলব আছে।

চারু হাসে—বেশ তো, ঐটুকু একটা মেয়ে না হয় একটু মতলবের খেলাই খেললো।

উপেন বলে—ঐ দেখ, আবার কেমন ঝগড়া শুরু করেছে অম্বি।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে চারু আর উপেন, সত্যিই আবার চেঁচাতে শুরু করেছে অম্বি।—আমার ডল কই আয়া? আমার ডল?

অম্বি বলে—আমার ডল কই?

আয়া—তোমার ডল নেই।

অম্বি—ইস্? সঙ্গে সঙ্গে রমার হাত থেকে ডল কেড়ে নেয় অম্বি। রমা কাড়বার চেষ্টা করতেই রমাকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। মুখ ভার করে বসে থাকে রমা। আড়ি করে—তোমার সঙ্গে খেলব না।

অম্বি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে রমার একটা হাত ধরে অনুরোধ করে—আমার ওপর অকারণে রাগ করো না লক্ষ্মীটি।

চারুবালার বিদ্রূপই সত্য হয়ে উঠলো। অম্বির মুখের মান-ভাঙানো কথাগুলি শুনতে পেয়ে চমকে ওঠে উপেন তারপর অপ্রস্তুতভাবে হাসতে হাসতে চলে যায়।

কিন্তু এই ধরনের ক্ষণিক মধুরতার দৃশ্য দেখে খুশী হয়েও পরমুহূর্তে উদ্বিগ্নভাবে ভাবতে থাকে উপেন আর চারুবালা। অম্বি যেন ধীরে ধীরে একটা ছলনা বিস্তার করছে। সাবধান হতে হবে। অম্বিরই কল্যাণের জন্য, আর নিজেদের জীবনকে একটা ভুল মায়ার জাল থেকে বাঁচাবার জন্য।

রমার জন্য মাস্টার ঠিক করা হয়েছিল। পড়াতে এল মাস্টার। রমার দেখাদেখি অম্বিও একটা বই নিয়ে মাস্টারের কাছে এসে বসে। আয়া এসে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই বিদ্রোহ করে অম্বি, চেঁচিয়ে আয়াকে খিমচে একটা অস্বস্তিকর দৃশ্য সৃষ্টি করে। মাস্টার অবাক হয়। উপেন এসে বলে—থাকুক, থাকুক।

চারুবালা অনুযোগ করে—থাকুক তো বললে, কিন্তু আর কতদিন?

—যতদিন অনাথ আশ্রমে না যায়, ততদিন এসব সহ্য করতেই হবে।

সহ্য করতে হলো আরও একটা দুঃসহ ঘটনা। প্রতিদিনের মত খাবার ঘরের টেবিলের কাছে বসে আদরের স্বরে ডাক দিলো উপেন—রমা! রমা!

সেই মুহূর্তে ছুটে আসে রমা। একটা পুডিং ভেঙ্গে চামচে দিয়ে রমাকে খাইয়ে দেয় উপেন। চারুবালা সামনে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে সে দৃশ্য দেখে। রমার নানা রকমের দুষ্টুমির কথা আলোচনা করে স্বামী আর স্ত্রী। উপেন হাসতে হাসতে বলে—এরই মধ্যে এটার মুখটা একেবারে তোমার মুখের মত হয়ে উঠেছে। দেখা মাত্র যে কেউ বলে দেবে, তোমার মেয়ে।

—কিন্তু মিসেস চক্রবর্তী যে বললেন, তোমার মুখের আদল পেয়েছে।

—আমি তো ও রকম কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

চারু রাগ করে—এ আবার কেমন কথা!

—আরে আমার নিজের মুখটা তো দেখতে পাচ্ছি না যে মিলিয়ে দেখবো।

অকস্মাৎ দু'জনেই চমকে ওঠে, নিকটেই যেন একটা শিশুকণ্ঠের কান্নাভরা চীৎকার ছটফট করছে। হ্যাঁ, অম্বিরই চিৎকার।

খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায়, অম্বিকে শক্ত করে ধরে রয়েছে আয়া। অম্বি দেখতে পেয়েছে, উপেন চামচ দিয়ে পুডিং খাইয়ে দিচ্ছে রমাকে। ছটফট করছে অম্বি, পাঁচ বৎসরের একটা পরের মেয়ে উপেনের হাত থেকে আদুরে পুডিং খাবার জন্য লুব্ধ হয়ে ছটফট করছে। আয়াকে চড় ঘুঁষি মেরে ব্যতিব্যস্ত করছে অম্বি। আয়া শেষে হার মেনে আর রাগ করে অম্বির হাত ছেড়েই দেয়—যাঃ। আর সহ্য করতে পারে না।

এক দৌড়ে ছুটে এসে অম্বি উপেনের খাবার টেবিলের কাছে দাঁড়ায়। পুডিং-এর দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটি লুব্ধ মুখের ঠোঁট কাঁপতে থাকে।

উপেনের হাত থরথর করে কাঁপতে থাকে। ছোট্ট একটা মেয়ের সামান্য একটা লুব্ধ দৃষ্টির দাবি, কিন্তু কী প্রচণ্ড এই দাবির শক্তি। চারুর মুখের দিকে বার বার ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায় উপেন। চারু মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।

অম্বি বলে—আমার পুডিং আপ্পি?

বিষণ্ণ ও করুণ হয়ে ওঠে উপেনের মুখ। ধীরে ধীরে চামচ তোলে, পুডিং ভাঙ্গে উপেন, দ্বিধাগ্রস্ত হাতটা কাঁপতে থাকে। একবার চামচ নামিয়ে তোয়ালে দিয়ে হাত মোছে উপেন। তারপর অন্যমনস্কভাবে মেজের দিকে তাকিয়ে থাকে।

অম্বি ডাকে—আমার পুডিং আপ্পি।

চামচ তুলে অম্বির মুখে পুডিং তুলে দেয় উপেন। চমকে ওঠে চারুবালা।

চলে যায় অম্বি, চলে যায় রমা। সেই চামচ দিয়েই নিজের খাবার খেতে যাচ্ছিল উপেন, চারু উত্তপ্তস্বরে বাধা দেয়—ও চামচ রেখে দাও।

উপেন শক্ত কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করে—কেন ?

জবাব দেয় না চারু। উপেন চেঁচিয়ে ওটে—বল, তুমি আপত্তি করছো কেন ?

চারু নিরুত্তর।

উপেন—ছোট জাতের মেয়ে চামচে মুখ দিয়েছে বলে চামচ অশুদ্ধ হয়েছে, এই তো। খানিকটা গোবর খেয়ে ফেললেই শুদ্ধ হতে পারা যাবে তো, তবে এত ভয় কিসের ?

উত্তর দেয় না চারু।

উপেন—বল, কিসের ভয় ? জাতের ভয় না মায়ার ভয় ?

চারু ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলে—মায়ার ভয়।

—কেন ?

—ভুল করছো তুমি। তুদিনের জন্য একটা পরের মেয়ে ঘরে রয়েছে, এই মাত্র, তাকে নিয়ে এত আদরের বাড়াবাড়ি কেন ?

—তুমি করছো না ?

—না, আমি তোমার চেয়ে ঢের শক্ত, ঢের সাবধান।

—ও।

চামচটাকে সশব্দে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে অন্য একটা চামচ হাতে তুলে নেয় উপেন। তাড়াতাড়ি খেতে থাকে। কিন্তু খাওয়া সমাপ্ত করে না। হঠাৎ খাবার ছেড়ে হাত ধুয়ে উঠে যায়।

সেদিন ছিল রমার জন্মদিন।

অম্বিও বায়না ধরলো, আমিও ঠিক রমার মত ফুলের মালা গলায় দিয়ে, চন্দনের টিপ পরে, আম্মির কোলে বসে পায়েস খাব।

চারুবালা বলে—না।

চারুবালার আঁচল ধরে ঘুরঘুর করতে থাকে অম্বি। নাকি-কান্নার সুরে সেই একই আবদার—আমার জন্মদিন চাই।

চারুবালা চেঁচিয়ে আয়াকে ডাক দিয়ে বলে—ওকে নিয়ে যাও আমার কাছ থেকে।

অম্বিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্য একটা ঘরে বন্ধ করে রাখে আয়া। চিৎকার শোনা যায়, ঘরের দরজায় লাথি মেরে সেই প্রচণ্ড আবদার একটানা এক সুরে ধ্বনিত হয়ে চলেছে।

—আমার জন্মদিন, আমার জন্মদিন। আম্মি, আমার জন্মদিন।

ঘরের ভিতর ছটফট ক'রে আর রাগ ক'রে ঘুরতে থাকে উপেন। যেন একটা ধিক্কার দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে—হুঁঃ, জন্মদিন, সেদিন কোন্ সর্বনেশে তারা ছিল আকাশে।

অন্য ঘরে চুপ করে বসে শুনতে থাকে চারুবালা, অম্বির চিৎকার। তারপর চোখ মোছে, তারপরেই ক্ষুব্ধভাবে উপেনের কাছে এসে বলে—আমি জব্দ হলে খুশী হবে তো? এস, দেখে খুশী হয়ে যাও।

এগিয়ে যেয়ে ঘরের বন্ধ কপাট খুলে অম্বিকে হিড়হিড় করে টেনে আনে চারুবালা। মালা পরিয়ে দেয়, চন্দনও পরিয়ে দেয়। গম্ভীর মুখে যেন বিনা আগ্রহের একটা কলের মত কাজ করে যায়। কোলের উপর অম্বিকে বসিয়ে পায়েস খাইয়ে দেয়। হেসে ওঠে অম্বির জলে-ভেজা চোখ।

শেষ হয় অম্বির জন্মদিনের অনুষ্ঠান। অম্বিকে কোল থেকে নামিয়ে, সেই রকমই গম্ভীর মুখে কলের মত ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর ঢুকে বিছানার উপর লুটিয়ে শুয়ে পড়ে চারুবালা।

শ্যামবাজারের পিসিমার চিঠি মাঝে মাঝে আসে।

পিসিমার চিঠিতে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ থাকে। একটি হলো বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে, কি রকম জমালে উপেন, আর কবে বাড়ি করছে উপেন? আর একটি হলো, রমার বিয়ের সম্বন্ধে ভবিষ্যতের একটা আগ্রহের কথা। আর, একটা বিক্ষোভের কথা—সেই অজাত মেয়েটা এখনো বাড়িতে আছে কেন?

সমাজের ভয় দেখিয়ে সাবধান করে দিয়েছেন পিসিমা। ভুল করলে, রমার বিয়ে নিয়েই ভবিষ্যতে মুশকিলে পড়তে হবে।—বুঝিলাম, তোমারা সেই অন্ত্যজা মেয়েটাকে ঘরে পুষিয়া রাখিয়াছ। এখন না হয় পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, কিন্তু একদিন দেশের দিকে ফিরিয়া আসিয়া সমাজের মধ্যে থাকিতে হইবে। বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ না যে, অজাত-কুজাতের ঐ মেয়ে ঘরে থাকিলে সমাজে তোমাদের যে নিন্দা রটিবে, তাহার ফলে বমার জন্য সদ্বংশীয় পাত্র সংগ্রহ কবাও অসম্ভব হইবে।

পিসিমার উপদেশগুলি যেন নিষ্ঠুর সত্যের মত চিন্তিত করে তোলে চারুবালাকে। চারুবালার কাছে এসে দাঁড়ায় উপেন। সান্ত্বনার সুরে আর শান্তভাবে বলতে থাকে।—ভুল যদি বলো, তবে আমার ভুল, তোমার ভুল, আর অম্বি নামে ঐ এতটুকু একটা মেয়েরও ভুল। আমরা সবাই না জেনে ভুল করছি। পিসিমা ঠিকই বলেছেন।

চারু—কিন্তু কিসের ভুল?

উপেন—আমার তো মনে হয়, আমরা কেউ ভুল করছি না। আমি ভুল করি নি, তুমিও ভুল করছো না, অম্বিও ভুল করছে না। শত হোক, একটা মানুষের মেয়ে তো। কাছে থাকলেই এরকম ভুল সবারই হবে।

—কাছে রাখাই যে ভুল হচ্ছে।

—হ্যাঁ, এটাই হলো কথা। কিন্তু, এবার বোধ হয় একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—কি ?

—দার্জিলিং-এ একটা অরফ্যানেজ আছে। বেশ ভাল ব্যবস্থা। অতি সুন্দর ব্যবস্থা। হাজার পাঁচেক টাকা থোক দিতে হবে। ব্যাস্, আর কোন দায় নেই।

—তবে, ওখানেই একটা ব্যবস্থা করে ফেল।

—করে ফেলতেই হবে, এখান থেকে চলে যাবার দিনও তো আর বড় বেশি বাকি নেই। এবার অনেক দূরে, একেবারে, সেই দেরাদুনের কাছে।

—চিরকালটা কি ঘুরে ঘুরেই কাটবে ?

—অন্তত আর পনরটা বছর তো বটেই।

—তারপর ?

—তারপর কলকাতা।

—পনর বছর পরের কথা ছেড়ে দাও, এখনকার কথাই ভাব। আয়াটাও জেদ ধরেছে, এইবার দেশে চলে যাবে। বুড়ো বয়সে আর বিদেশে থাকতে চায় না। চাকরিও করতে চায় না।

—কেন ?

—রমা আর অম্বি ওকে বড় মারধর করে।

দরজার কাছেই আয়ার ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর শোনা যায়।—হামি আর থাকতে পারবে না সাব।

উপেন—কেন ?

আয়া—এ নোকরি আচ্ছা নেহি সাব। মায়াভি হোবে, আর মারভি খাইবে।

উপেন বলে—না, আর বেশি দিন নয়। শিগগিরই তোমাকে ছেড়ে দেব।

আয়া চলে গেলে যেন একটু আতঙ্কিতের মতোই বিষণ্ণ স্বরে উপেন বলে—দেখলে তো আয়া 'কেমন সাবধান হয়ে গিয়েছে। মায়াভি হোবে, মারভি খাইবে, আমাদেরও এই দশা হবে, যদি সাবধান না হই।

শেষ কথায় চারুবালাকে একটু উৎসাহিত করে চলে যায় উপেন—দার্জিলিং-এর অরফ্যানেজে টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছি, মনে হচ্ছে দু'এক দিনের মধ্যেই উত্তর এসে পড়বে।

ভুল হয় নি উপেনের অনুমানে। উত্তর এল দুদিন পরেই।

বাস্, এখন শুধু পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক, আর সেই সঙ্গে অম্বিকে নিয়ে একদিন মাস্টারকে দার্জিলিং রওনা করিয়ে দিতে হবে, আর কোন সমস্যা নেই।

এক গাদা রঙীন খেলনা, জামা-কাপড়, ছবি, টফি, চকোলেট আর লজেন্স কিনে এনে টেবিলের উপর ঢেলে দিলো উপেন। অম্বিকে ডাক দিয়ে বলে—অম্বি, এই সব তোমার।

—আমার ?

—হ্যাঁ, কিন্তু মাস্টার মশাই-এর কথা শুনতে হবে, তবে এসব পাবে।

মাস্টারের কানের কাছে ফিস-ফিস ক'রে বলে যায় উপেন—বাস্, আমাকে দিয়ে আর কোন কাজ করাবার চেষ্টা করবেন না। এইবার সব দায় আপনার। ভুলিয়ে-ভালিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে রওনা হয়ে যান, আমাকে কিন্তু আর কোন পরামর্শ করতে ডাকবেন না। আমি চললাম।

মুখ কালো ক'রে, দুপ-দাপ ক'রে হাঁটতে হাঁটতে, যেন নিজেরই মনের ভিতরের একটা আর্তনাদের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করতে করতে চলে যায় উপেন। চারুবালার কাছে গিয়ে বলে আমি আজ টুরে চললাম, কাল ফিরবো।

চারুবালার কোন আপত্তি গ্রাহ্য না ক'রে বের হয়ে গেল উপেন।

মাস্টার মশাই চারুবালাকে আশ্বস্ত করেন—কোন চিন্তা করবেন না, এ আর কি এমন কঠিন কাজ ?

অম্বির শিশু-মনকে প্রলুব্ধ করার জন্য গল্পের ফাঁদ পাতেন মাস্টার। নতুন দেশের কথা। বরফের দেশ, ঝরনার দেশ, চাঁদের দেশ, সোনার সূর্য ভাসে সেই দেশের আকাশে।—যাবে অম্বি ? প্রশ্ন করেন মাস্টার। মুগ্ধ শিশুচক্ষের বিস্ময় নিয়ে উত্তর দেয় অম্বি—যাব।

সমস্ত বাড়িটাই যেন ভয়ে অভিভূত হয়ে রইল। রওনা হবার জন্য তোড়জোড় করছেন মাস্টার মশাই। রমাকে নিয়ে আয়া চলে গেল। অম্বির, পাঁচ বছর বয়সের একটা মেয়ের চোখের দৃষ্টি আর মুখের ভাষার শব্দকে ভয় পেয়ে এই বাড়ির আত্মা যেন মুখ লুকিয়ে ফেলছে। চারুবালাও একটা ঘরের ভিতর নিজেকে বন্ধ ক'রে রাখলো, যেন এই দৃশ্য চোখে দেখতে না হয়।

মাস্টারের কাছে কতবার জিজ্ঞাসা করেছে চারু।—আশ্রমে কোন কষ্ট দেয় না তো। মাস্টার বলেছেন—আপনি বিশ্বাস করুন, যে অরফ্যানেজে ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানকার খাওয়া-পরা-থাকা সাজপোশাক আপনার এই এখানকার তুলনায় অনেক ভাল। খুব সুখে থাকবে মেয়েটা। লেখাপড়া, গান, সব শিখবে। বড় হয়ে ডাক্তারী পড়তে পারবে। আপনি বৃথা ভাবছেন।

হ্যাঁ, বিশ্বাস করেছে চারুবালা। সুখেই থাকবে মেয়েটা, এই বাড়ির সুখের চেয়ে সেখানে অনেক বেশি সুখ! কিন্তু তবু কেন স্বস্তি পায় না মন ? মনে হয় ছোট্ট একটা অবুঝ মেয়েকে লোভ দেখিয়ে বনবাসে পাঠানো হচ্ছে। সব চেয়ে বেশি রাগ হয় নিজেরই উপর। এতদিন ধরে যাকে ছেড়ে দেবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছিল মন, আজ ছেড়ে দেবার এত ভাল সুযোগ পেয়েও এরকম দুঃসহ অস্বস্তি বোধ হয় কেন ?

বন্ধ ঘরের নিভৃতে বসে শুনতে পায় চারুবালা, মাস্টারের পায়ের শব্দের পিছু পিছু দুটি ছোট ছোট পায়ের জুতোর শব্দ নিকটে এগিয়ে আসছে। রওনা হয়েছেন মাস্টার। চলে যাচ্ছে অম্বি।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় অম্বি। প্রশ্ন করে মাস্টারকে—রমা যাবে না?

—না।

—আপ্পি?

—না।

—আম্মি?

—না।

—তবে আমিও যাব না।

এইবার মাস্টার বাধ্য হয়েই কৌশলের সাহায্য নেন। হেসে হেসে প্রচণ্ড একটা মিথ্যা কথা বলেন—আপ্পি, আম্মি, রমা সবাই সেখানে আগেই চলে গিয়েছে।

ব্যস্ত হয়ে ওঠে অম্বি—অ্যাঁ, আমিও যাব।

ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। ট্যাক্সিতে জিনিসপত্র চাপানো আছে। মাস্টার আগে আগে চলে যাচ্ছেন। পিছনে অম্বি। ট্যাক্সির কাছে পৌঁছতেই মাস্টার হঠাৎ একটা আর্তনাদের প্রতিধ্বনি শুনে পিছন ফিরে তাকান। দেখতে পান, বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আছে চারুবালা।

সেই মুহূর্তে, চারুবালাকে লক্ষ্য ক'রে পিছনে ছুটতে থাকে অম্বি—ঐ যে আম্মি, আম্মি আম্মি।

মাস্টার তারস্বরে চেঁচিয়ে নানা প্রলোভনের কথা ঘোষণা করতে থাকেন—এই যে, এখানে কত লজেন্স, পুতুল, আর ছবি আছে অম্বি, কত গণেশ আর সিংহ। চল যাই সেখানে, যেখানে চাঁদের দেশ, বরফের পাহাড়, ঝর্ণার গান, বনের পরী।

কিন্তু বৃথা, আম্মি নামে একটি মায়াভরা মূর্তির কাছে চাঁদের দেশের আহ্বানও মিথ্যে হয়ে যায়।—না, আমি যাব না। কখ্খনো যাব না। বলতে বলতে চারুবালার দিকে ছুটেই চলেছে অম্বি।

অম্বি এসে চারুবালার স্তব্ধ মূর্তিটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু চারুবালার হাত দু'টো, আর সেই সঙ্গে বুকের ভিতরটাও যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। অম্বিকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরবার জন্য হাত দুটো একবার ছট্‌ফট করে ওঠে। তবু যেন অনেক কষ্টে হাত দুটোকে শক্ত ক'রে রাখে চারুবালা। অম্বির মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসি হাসতে থাকে। অম্বি বলে—মাস্টার বড় দুষ্টু, মিথ্যুক।

চারু প্রশ্ন করে—কেন? কি করেছেন মাস্টার মশাই?

অম্বি বলে—তোমাকে লুকিয়ে রেখেছিল।

চোখ ছলছল করে, গম্ভীর হয় চারুবালা। অম্বিই সান্ত্বনা দেয়—আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব না আম্মি, তুমি কেঁদো না।

দু'দিন পরে বিষণ্ণ পরিশ্রান্ত বেদনাহত মূর্তি নিয়ে আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে চারদিকে উঁকি দিতে দিতে ঘরে ঢুকলো উপেন। টুর থেকে ফিরে এসেছে উপেন। জানে উপেন, অম্বি চলে গিয়েছে। এক একটা শূন্য ঘর আর বারান্দার ভিতর দিয়ে চলতে চলতে রুমাল বের করে চোখ মোছে উপেন। হঠাৎ চমকে ওঠে, কি যেন দেখতে পায় উপেন। এক জায়গায়, মেজের উপর, অম্বিরই একটা ডল পড়ে আছে। ফোলা ফোলা গাল, হাসি হাসি মুখ একটা ডল। ডলটা তুলে নিয়ে, ডলের মুখে হাত বুলিয়ে, আর জলভরা চোখ নিয়ে আর দাঁত চিবিয়ে, কে জানে কার উপর রাগ ক'রে বলতে থাকে উপেন—ডল, পুতুল মাত্র, কাঠখড়ের পুতুলও ঘরের ভালবাসা পায়,...কিন্তু মানুষের মেয়ে...আবর্জনা...ঘরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দাও।

অকস্মাৎ আড়াল থেকে হাসিতে আর আহ্লাদে উপচে পড়া মিষ্টি একটা ডাক যেন বাঁশির সুরের মত বেজে ওঠে—আপ্পি।

বিস্ময়ে চমকে ওঠে, আর মুখ হাসিতে ভরে ওঠে উপেনের। —সে কি রে অম্বি, তুই?

অম্বি ছুটে এসে উপেনের হাত ধরতে যায়। আলগোছে হাত সরিয়ে নেয় উপেন। অম্বি বলে—মাস্টার বড় দুষ্টু।

—বুঝেছি। আর দুষ্টুমি করবে না মাস্টার।

অম্বির অভিযোগের মর্ম বুঝতে কোন অসুবিধা নেই। বুঝেছে উপেন, বুঝেছে চারুবালা। অম্বি যেন বলতে চায়—আমি যাব না। দুনিয়ায় যে-সব মাস্টারীর শাসন আমাকে তোমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চায়, সেই সব মাস্টারী বড় দুষ্টু, বড় নিষ্ঠুর।

না, আর এরকম নিষ্ঠুরতা করা উচিত হবে না। মেয়েটার মনটা এই বাড়িকেই আপন ক'রে নিয়েছে। সুতরাং থাকুক না, বাড়ির মেয়ের মত হয়েই। বড় হোক, বেঁচে থাকুক তারপর ভগবান একটা উপায় করে দেবেনই। সাধারণ গেরস্থ ঘরের যে কোন জাতেরই হোক না কেন, খেয়ে পরে একরকম সুখে আছে, এরকম একটা পাত্র কি পাওয়া যাবে না? ভাল বরপণ দিলে পাওয়া যাবেই।

স্বামী-স্ত্রীর আলোচনায় এই নতুন সিদ্ধান্ত জন্মগ্রহণ করে। বাড়ির মেয়ের মতই থাকুক অম্বি। কিন্তু,...কিন্তু ও যেন বুঝতে পারে যে, ও হলো এই বাড়ির মেয়ের মত। আর বেশি কিছু নয়। নইলে...নইলে আবার সমস্যা দেখা দেবে।

কদিন পরেই সমস্যাটা আবার দেখা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন হয়ে আর অতি সাবধানতায় অবিচল থেকে, সেই সমস্যাকে অঙ্কুরেই ছিন্ন করে দিল চারুবালা ও উপেন।

রমার সঙ্গে হিংসুটেপনায় আর একটু দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিল অম্বি। কিন্তু অম্বিকে বুঝিয়ে দিলো চারুবালা ও উপেন, রমার অধিকারে আর অম্বির অধিকারে অনেক পার্থক্য আছে।

ঘটনাটা এই। এক সন্ধ্যায় চারুবালার শোবার ঘরে ঢুকেই দেখতে পায় অম্বি, খাটের উপর চারুবালার বিছানার পাশেই, যেন চারুবালার বুক ঘেঁষে, আর একটি ছোট্ট বিছানা রয়েছে, ছোট্ট একটি বালিশও।—অ্যাঁ, এখানে রমা শোয়, বুঝেছি। চেঁচিয়ে ওঠে অম্বি।

বায়না ধরে অম্বি—আমিও আম্মির কাছে শোব!

আয়া বলে—কভি নেহি। আয়াকে খিমচে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, নিজের ছোট্ট বালিশটা আয়ার ঘর থেকে নিয়ে ছুটে আসে অম্বি। চারুবালার বিছানার এক পাশে রাখে, গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ে।

প্রমাদ গণে চারুবালা। ঘর থেকে সরে গেল চারুবালা। আয়া এসে অম্বিকে বোঝায়—এখানে তোমার শুতে নেই।

—কেন? রমা শোয় কেন?

আয়া বলে—রমা হলো আম্মিব মেয়ে।

—আমি তাহলে কি?

—তুমি আম্মিব মেয়ে নও।

অন্য ঘরে গম্ভীর হয়ে বসে ছিল উপেন আর চারুবালা।—আম্মি, আম্মি! চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসে অম্বি।—

চারুবালা—কি?

অম্বি—আম্মি, রমা বুঝি একলাই তোমার মেয়ে?

চারু—হ্যাঁ।

অম্বি—আমি আম্মি?

চারুবালা করুণভাবে হাসে—তুমি আমাদের মেয়ের মত।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পাঁচ বছর বয়সের একটা মূর্তি। ওর জীবনের সবচেয়ে বড় মায়াময় কৌতূহল যেন আজ সব চেয়ে কঠিন

একটা উত্তরের আঘাত পেয়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে। দুষ্টু অম্বিকে মুহূর্তের মধ্যেই একেবারে ধীর স্থির ও শান্ত ক'রে দিয়েছে, ঐ একটি উত্তর।

উপেন বলে—খেয়েছ অম্বি ?

অম্বি—না।

উপেন—খেতে যাও, আয়া খাইয়ে দেবে।

শান্তভাবেই, বাধ্যভাবে, ধীরে ধীরে চলে যায় অম্বি।

ধীরে ধীরে শোবার ঘরে ঢোকে। চারুবালার বিছানার এক পাশে ছোট বালিশে ঘুমিয়ে আছে রমা। রমার মুখের দিকে একবার তাকায়। তার পর নিজের ছোট বালিশটাকে হাতে তুলে নিয়ে চলে যায় অম্বি।

জাতের ভয়ে নয়, মায়ার ভয়ে যে সাবধানতার প্রাচীর তুলে দিল উপেন আর চারুবালা, সেই প্রাচীর অটুট হয়েই রইল এই পরিবারের আরও পনরটি বছরের জীবনে। বেরিলি গোরখপুর আর শিলিগুড়ি, একে একে সার্ভিসের এক একটি অধ্যায় শেষ ক'রে অবসর জীবনের আশ্রয় কলকাতার বাড়িতে এসে যখন ঠাঁই নিলেন উপেন, তখনও দেখতে পাওয়া গেল যে, এই পরিবারের বাপ-মায়ের স্নেহের কক্ষটি সেইরকমই দুভাগে ভাগ করা আছে। সেই প্রাচীর আজও আছে।

একটি ঘরে চারুবালার খাটের পাশেই আর এক খাটে শোয় আপন মেয়ে রমা, আর পাশের ঘরে একটি খাটে শোয় অম্বি। দুই ঘরের মাঝখানে একটি দরজা, এবং এই দরজা যদিও বন্ধ থাকে না, তবু একটি পর্দা ঝুলতে থাকে। আপন মেয়ে আর পরের মেয়েকে এইভাবেই পৃথক ক'রে রেখেছেন চারুবালা। আপন মেয়ে রমা হলো নিকটে, আর পরের মেয়ে অম্বি একটু দূরে।

বিগত পনর বছর ধরে এই সাবধানতার প্রাচীরকে একটু একটু করে আরও কঠিন করে তুলতেও ভুলে যান নি উপেন আর চারুবালা। রমাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য মাস্টার এসেছে। এসেছে ইংরেজীর মাস্টার, আর গানের ও শেলাই-এর মাস্টারণী। অম্বি শুধু একটু দূর থেকে আর আড়াল থেকে দেখেছে। কাছে যায় নি। নিষেধ ক'রে দিয়েছেন আপ্পি আর আম্মি।

এই ব্যবধান স্বীকার করে নিয়েছিল অম্বি। মেয়ে নয়, মেয়ের মত হয়ে থাকবার যে অধিকার পেয়েছে অম্বি, সেই অধিকারের চেয়ে বেশি কোন অধিকার তার নেই।

অম্বি হয়তো বুঝতে না পেরে প্রথমে একটু আশ্চর্য হয়েছিল, কি ক্ষতি হবে লেখাপড়া শিখলে? কেন তাকে গান শিখতে দিতেও এত আপত্তি করেন আপ্পি আর আম্মি?

উপেন আর চারুবালার চিন্তার যুক্তিগুলি কোনদিন দেখতে পায় নি, তাই বুঝতেও পারেনি অম্বি।

সাবধান হয়েছিলো উপেন, সমাজের দিকে তাকিয়ে। আর অম্বির ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে। লেখাপড়া শিখে অম্বি যদি একটা ভদ্রলোকের মেয়ের মনের মত মন পেয়ে বসে, তবে সমস্যা যে আরও জটিল হয়ে উঠবে।

বহু দূর অতীতের সে-সব চেষ্টার কহিনী এখন অতীতের একটা স্মৃতি মাত্র। আজ দেখা যাচ্ছে, উপেন আর চারুবালার প্রত্যেকটি পরিকল্পনা যেন ব্যর্থ ক'রে দিয়ে বড় হয়ে উঠেছে অম্বি। যে মেয়েকে ভদ্রলোকের মেয়ের মত হতে দিতেও চায় নি, বাড়ির মেয়ের মতও মনে করতে চায় নি, সেই মেয়ে আজ তাঁদের নিজের মেয়ের মত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু ঐ মেয়ের মত পর্যন্ত, বাস, আর নয়, তার বেশি নয়। অম্বিকে মানুষ করতে করতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থেমে গিয়েছে উপেন আর চারুবালা। কারণ, সমস্যাটা এসেই পড়েছে।

রমার বিয়ে দিতে হবে, অম্বিরও বিয়ে দিতে হবে। ভয় হয়, অম্বি যদি রমার মতই শখ আর মন পেয়ে বসে? রমার জন্য যে-রকম পাত্র পাওয়া যাবে, অম্বির জন্য সে-রকম পাত্র তো আর পাওয়া যাবে না। জাত-পাত-জন্মের ইতিহাস নিয়ে অম্বির একটা পরিচয় আছে, আর সেই পরিচয়টা তো সুবিধের নয়। সুতরাং, কে বিয়ে করবে অম্বিকে, জাত-পাত শিক্ষা-দীক্ষা ও অবস্থার দিক দিয়ে একটু নীচু গোছের মানুষ ছাড়া? তাই একটু কঠিনভাবেই সতর্ক হয়েছেন উপেন ও চারুবালা।

একজন মেয়ে, আর একজন মেয়ের মত। এই নিয়মে নিজেদের মনকে বেঁধে রেখেছেন উপেন ও চারুবালা। কিন্তু বাইরের আগন্তুকের চোখে ঠিক উল্টোটাই বোধ হয়। মনে হয়, রমাই যেন একটু দূরের একটা প্রাণ, আর অম্বি একেবারে নিকটের। রমা যেন এবাড়ির স্নেহ আর আদরের মাথায় চড়ে বসে আছে, আর অম্বি রয়েছে কোল ঘেঁষে আর বুক ঘেঁষে।

ভোরে ঘুম ভেঙ্গে চোখ মেলে ঘড়ির দিকে তাকাতেই ব্যস্ত হয়ে উঠে বসে অম্বি। মনে পড়ে যায়, ঘরের নানান কাজের কথা। মনে পড়ে আপ্পি এতক্ষণে বাইরে বেড়াতে যাবার জন্য তৈরী হয়ে বসে আছে। কিন্তু ঠাকুরটা কি চা এনে দিয়েছে এতক্ষণে? নিশ্চয়ই দেরি করছে ঠাকুর। প্রথমেই ঠাকুরকে চায়ের তাগিদ দেয় অম্বি। পরে নিজেই ব্যস্তভাবে চা তৈরি ক'রে নিয়ে উপেনের হাতের কাছে এনে দেয়। সস্নেহ স্বরে কথা বলেন উপেন, তুই এত ব্যস্ত হয়ে উঠিস কেন অম্বি? দুমিনিট দেরি হলোই বা।

উপেন বেড়াতে যাবেন, কিন্তু অম্বি একবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উপেনকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেয় না।—এ আলোয়ানটা ছেঁড়া,

এটা কেন গায়ে দিয়েছ? ঘরের ভিতর থেকে অন্য একটা আলোয়ান নিয়ে এসে উপেনের গায়ে জড়িয়ে দেয় অম্বি।

রাঁধুনী-দিদির সঙ্গে আলাপ করে অম্বি, ঘরে কি আছে আর কি নেই, এবং কি আনতে হবে। নিজেই ঘরে ঢুকে মশলার শিশি থেকে তরকারির ডালা পর্যন্ত অন্বেষণ করে। তারপর লিখতে বসে বাজারের ফর্দ। উপেন ভোরের হাওয়া খেয়ে ফিরে এসেই আবার বাজারে যান একবার। অম্বি তার আগেই বাজারের ফর্দ আর হিসাব তৈরি ক'রে রাখে।

এঘর আর ওঘর ঘুরে কাজ করে অম্বি। ঠাকুর চাকর ও মালীকে নির্দেশ দেয়। বাগানের গাছে জল দেওয়া থেকে শুরু ক'রে বারান্দার ফুলের টবের সেবার কাজ পর্যন্ত, সবই একবার নিজের চোখে না দেখে নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না অম্বি। এই বাড়ির প্রাণটাকেই যেন দুহাতে আগলে রাখতে চায় অম্বি, তারই জন্য ক্লান্তিহীন কাজের দায় গ্রহণ করেছে। কোন্ কাপড় ধোপাকে দিতে হবে, আর কোন্ কাপড় বাড়িতেই কাচতে হবে, তারও লিস্ট ক'রে ফেলে অম্বি। তাগিদ দেয় ঠাকুরকে, আম্মির স্নানের জন্য গরম জল হলো কি না?

এই ভাবেই চলে অম্বির কাজের-জীবনের পালা। রমার জীবনের পালা অন্য রকমের। সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্যস্ত হয়ে ওঠে রমাও। সে ব্যস্ততার রূপ ভিন্ন। পড়ার তাগিদ, লেখার তাড়া। কলেজের উৎসবে আবৃত্তি করতে হবে, তার জন্য শেক্সপীয়র আর মাইকেল থেকে কবিতা মুখস্থ করার সাধনা। স্পোর্টসও আসছে, স্কিপিং-এর দড়ি নিয়ে ছাদে চলে যায় রমা। টিউটর আসেন। রমার পড়ার ঘরে যখন জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পাঠ মুখর হয়ে ওঠে, তখন অন্য ঘরে আলনার উপর আম্মির ধুতি আর চাদর গুছিয়ে রাখতে থাকে অম্বি। তারপর কলেজের বাস আসে। ব্যস্তভাবে হেঁটে বাসের ভিতরে গিয়ে বসে রমা।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে অম্বি। মুখে হাসি লেগে থাকে অম্বির কিন্তু সে হাসি যেন একটু ক্লান্ত। শরীরটাকেও এতক্ষণে যেন একটু ক্লান্ত বলে মনে হয় অম্বির। আস্তে আস্তে বাগানে নেমে এক গাছের ছায়ায় বসে লেস বুনতে থাকে অম্বি।

এই লেস বোনাও যেন অম্বির জীবনের এক বে-আইনী সাধনা, তাই সন্তর্পণে আর চারদিকে চোখ রেখে লেস বোনে অম্বি। আম্মি যেন না দেখতে পান। গানও শুধু গুনগুন করে অম্বির মুখে, একটা তৃষ্ণাকে যেন বুকের ভিতর গোপন করে রাখছে অম্বি। যেন শুনতে না পান আম্মি। কারণ, এই সবই তার জীবনের নিষেধ।

ব্যারাকপুরের এই নতুন বাড়ির আর এক নিভৃতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে চিন্তাকুল আলোচনা চলতে থাকে।

চারুবালা বলে—সেই তো, সেই সমস্যাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো। পরের মেয়ে নিজের মেয়ের মত হয়ে উঠলো, অথচ···।

উপেন—কি হলো?

চারু—কে এখন বিয়ে করবে এই নিরেট মুখখু মেয়েকে?

উপেন—সমস্যাই বটে। তবে, ধর, বাঙালী সমাজেরই মধ্যে যদি এমন কোন ছেলে পাওয়া যায়, জাতে যাই হোক, লেখাপড়া সামান্য কিছু শিখেছে, আর ছোটখাট চাকরি বা দোকানদারি-টারি করছে, খেয়ে পরে বাঁচবার মত রোজগার করছে···।

চারু—পাওয়া আর যাবে না কেন। খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে।

উপেন—তা ছাড়া, যদি ভাল বরপণ দিই তবে···।

চারু—তাহলে তো হয়েই গেল। অম্বির মত মেয়েকে খুশী হয়ে বিয়ে করতে রাজী হবে।

হঠাৎ রুক্ষস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন উপেন—কিন্তু অম্বি রাজী হবে কি?

স্বামী-স্ত্রীতে আবার বচসা বাধে। সেই পুরনো আক্ষেপ আর অভিযোগ। অম্বি যদি রাজী না হয় তবে তার জন্য দায়ী কে? কে ভুল করেছে? অম্বিকে লেখাপড়া না শেখাতে বলেছিল কে?

স্বামী-স্ত্রীতে আর একটা প্রশ্ন নিয়ে অভিযোগের হানাহানি চলতে থাকে। কে আদর দিয়ে দিয়ে অম্বির মনটাকে শৌখিন ক'রে তুলেছে? উপেনের মতে, আদর দিয়েছেন চারুবালা। চারুবালার মতে, আদর দিয়েছেন উপেন।

স্বামী-স্ত্রীর, এই বাড়ির বাপ ও মার এই রুক্ষ রুষ্ট কথার হানাহানির মধ্যে যেন একটা করুণতা আছে। বুঝতে পেরেছে দুজনেই, অম্বির মন তাঁদেরই মেয়ের মত একটা মন হয়ে উঠেছে। যার তার হাতে অম্বিকে গছিয়ে দিলেই কি সুখী হতে পারবে অম্বি?

স্বামী-স্ত্রীর আলোচনার স্বর আবার শান্ত হয়ে আসে। সমস্যার সমাধানের জন্য এইবার একটু শক্ত মন নিয়ে প্রস্তুত হতে হবে। সিদ্ধান্ত করেন দু'জনেই। প্রথম, খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হোক।

সুশ্রী সুন্দরী গৃহকর্মনিপুণা পাত্রী, সাধারণ লেখাপড়া জানা, সাধারণ উপার্জনক্ষম পাত্র হলেই চলবে। ভাল যৌতুক দেওয়া হবে।

আর, দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হলো, অম্বি যেন বুঝতে পারে যে, আপত্তি করা বা রাজী না হওয়া ওর পক্ষে সাজে না। রমার পক্ষে যা সাজে, ওর পক্ষে তা সাজে না। রমা এ-বাড়ির মেয়ে এবং অম্বি এ-বাড়ির মেয়ে নয়। সুতরাং, নিজের ভাগ্যকে চিনতে শিখে আর মেনে নিয়ে যেন অম্বিও বিদায় নেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রাখে।

চারুবালা বলে—যাতে রাজী হয়, তাই করতে হবে।

রমাকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই। রমার জন্য উপযুক্ত পাত্র [illegible]রলেই পাওয়া যাবে। সমস্যা হলো অম্বিকে নিয়ে। তাই

অম্বির একটা গতি করে ফেলতেই হয়। আগে অম্বির বিয়েটা হয়ে যাক, তার পর রমার।

মাত্র ছুটি মাস হলো ব্যারাকপুরের এই নতুন বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে উপেন-পরিবার। এই বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে গঙ্গার জলে সূর্যাস্তের রক্তিম ছবি আর গান্ধী-মঠের সাদা চূড়া দেখা যায়। বাড়ির নির্মাণও এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। পশ্চিমের বারান্দার সিঁড়িটা, দোতলার দক্ষিণের ব্যালকনি এখনো অসম্পূর্ণ। প্রতি-বেশীদের সকলের সঙ্গে এখনো ভালো করে পরিচিতও হন নি উপেন।

পাশের বাড়ির জানালায় মহিলাদের কৌতূহলী চক্ষু মাঝে মাঝে এই বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। নিকটের বাড়ির ছুই ফ্ল্যাটের ছুই বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রতিবেশিনী ছুই মহিলার মধ্যে আলোচনা এবং গবেষণাও মাঝে মাঝে ধ্বনিত হতে শোনা যায়। বিশেষ করে রমা আর অম্বির সম্পর্কেই আলোচনা হয় বেশি।

একজন বলেন—পিঠাপিঠি ছুই বোন বলেই তো মনে হয়। কিন্তু বয়স যেন সমান সমান।

আর একজন বলেন—নিশ্চয় যমজ বোন।

—মেয়ে ছুটো ভালই।

—একটি একটু বেশি শান্ত।

—একটি একটু বেশি চঞ্চল।

—একজন বাপের মুখের আদল পেয়েছে, আর একজন মায়ের মুখের আদল পেয়েছে।

তৃতীয় আর এক মহিলা আর এক ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আলোচনায় যোগ দেন এবং সকলকে চমকে দিয়ে বলেন —ছু-বোন নয়।

—তবে।

—একজন হলো উপেনবাবুর মেয়ে।

—কোন্‌টি ?

—ঐ, যেটি কলেজে পড়ে।

—আর একটি কে ?

—আর একটি হলো মেয়ের মত।

—সে আবার কি ?

—কি জানি, মেয়ের মার সঙ্গে আলাপ হলো, উনি তো তাই বললেন।

সেই ক্ষণে উপেনের বাড়ির জানালায় দুটি হাসি-হাসি মুখ এক সঙ্গে দেখা দেয়।

একজন প্রতিবেশিনী বলেন—তোমাদের কথাই হচ্ছিল।

রমা—কি কথা ?

প্রতিবেশিনী—ও তোমার কে হয় ?

রমা—বোন।

প্রতিবেশিনী—এ কিরকম হলো ? তোমার মা বললেন, ওটি হলো তাঁর মেয়ের মত।

রমা—তাতে কি হলো ?

প্রতিবেশিনী—তাহলে তো আর বোন হলো না।

রমা—তাহলে বোনের মত ?

বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কথাটা বলেই জানালা থেকে সরে আসে রমা। আর ঘরের নিভৃতে এসে অম্বিকে যেন ঠাট্টা ক'রে রাগাতে থাকে—বোনের মত ! বোনের মত !

মেয়ের মত, এই কথাটাকেই যেন সহ্য করতে পারে না অম্বি। কিন্তু সহ্য করতে হয়। আম্মি বা আপ্পি, যখনি যাঁর কাছে অম্বির পরিচয় দেবার সময় এই কথাটা তাঁরা উচ্চারণ করেন, তখনই অম্বির বুকের ভিতর যেন একটা কাঁটার খোঁচা লাগে। মলিন হয়ে ওঠে মুখটা। কখনো আভাস দিয়ে ছলছল করে চোখ। এটা যে একটা পরিচয়ই নয়। কথাটা প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দেয়

অম্বিকে, এই পৃথিবীতে যেন বিনা অধিকারে আর ভুল ক'রে জন্ম লাভ করেছে ওর জীবন।

অম্বির বিষণ্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে রমা যেন আজ একটু বেশি বিচলিত হয়। অম্বির হাত ধরে টান দেয় রমা।—আয় তো একবার আমার সঙ্গে।

আপত্তি করে অম্বি, কিন্তু অম্বিকে জোর ক'রে হিড়-হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যায় রমা। একেবারে এসে থামে সেই ঘরের দরজার কাছে, যে-ঘরের নিভৃতে বসে আলাপ করছিলেন উপেন আর চারুবালা।

উপেন আর চারুবালাকে চমকে দিয়ে প্রশ্ন করে রমা।—তোমরা অম্বিকে শুধু 'মেয়ের মত' 'মেয়ের মত' কর কেন?

ভয়ার্তের মত বিব্রতভাবে তাকিয়ে থাকেন উপেন আর চারুবালা। রমা বলে—আজ পর্যন্ত আমাকে বললেই না, ও আমার কে?—আমার বোন নয়?

চারুবালা বলেন—বোন বৈকি?

—তবে তোমার মেয়ের মত হয় কি করে?

—তুই ওসব বুঝবি না।

—বুঝিয়ে দিতে হবে।

—ওকে আমরা পেলেছি।

—আমাকে পাল নি বুঝি?

—ওকে হঠাৎ পেয়ে গিয়েছি।

—আর আমাকে?

—তুই যা, ওঠ এখান থেকে। তুমি অনেক জ্বালা জ্বালিয়ে হাড়মাস ভুগিয়ে তবে এসেছ।

রমা বলে—বুঝলাম, অম্বি তোমাদের জ্বালায় নি বলেই ও হলো মেয়ের মত।

উপেন ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে যেন তাঁর নিঃশ্বাসের বেদনা

দমন করবার চেষ্টা করেন। রমা বলে—আম্মি কথাটার মানে কি মা? মায়ের মত?

চারুবালা রাগ করেন—মায়ের মত কেন হবে! ওটা একটা কথা, কথাটার মানে হলো, মা।

রমা—শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াচ্ছে, ও হলো আমার বোন, তুমি হলে ওর মা, কিন্তু ও হলো তোমার মেয়ের মত। অদ্ভুত!

চলে গেল রমা। অম্বিকেও হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে গেল। অম্বি বলে—তুই কি আবোল-তাবোল বকছিস, আম্মি কি ভাববেন বল তো?

কিন্তু ঘরের নিভৃতে নীরব হয়ে বসে রইলেন উপেন আর চারুবালা। রমা মেয়েটার মুখরতাগুলি কি ভয়ানক! মুহূর্তের মধ্যে মনের কতগুলি গর্ব বিশ্বাস ও ধারণাকে যেন এলোমেলো ক'রে দিয়ে গেল রমার প্রশ্ন আর মন্তব্যগুলি।

কথা প্রসঙ্গে উপেন আর চারুবালার মধ্যে আলোচনা আবার একটু উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উপেন বলেন—অম্বি যদি আজ আমাকে বাপের মত মনে করে, আর তোমাকে মায়ের মত মনে করে…।

চেঁচিয়ে ওঠেন চারুবালা—কেন মনে করবে?

উপেন—কি আশ্চর্য, কথাগুলি গায়ে বিঁধছে কেন তোমার? তুমি তো এই চাইছ। অম্বি যেন আমাদের আপন বাপ-মা বলে না মনে করে, এতদিন ধরে অম্বিকে তাই মনে করাতে চেয়ে এসেছ, চেষ্টাও করে আসছো। তবে আজ কেন…।

চারুবালা প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে শেষে অভিযোগ করেন—আমাকে তর্কে হারিয়ে তুমি কি সুখ পাচ্ছ বুঝি না। কিন্তু আমি ভালর জন্যই চেয়েছি, অম্বি যেন নিজেকে রমার সমান মনে না ক'রে বসে।

অগত্যা উপেনও তাঁর মনের অভিমান আর উষ্মাকে একটু শান্ত ক'রে আনেন এবং চারুবালার মতেই সায় দিয়ে স্বীকার করেন—

হ্যাঁ, সমস্যা হলো সেইখানে। জাত বুঝে একটু নীচু ঘরে, নীচু অবস্থার ঘরেই ওকে বিয়ে দিতে হবে, কিন্তু ও এই ভুলই বুঝবে যে, আমরা ওর ওপর নিষ্ঠুরতা করিলাম।

চারুবালা বলেন—উচিত হচ্ছে, এবার একটু ভাল করেই শক্ত হওয়া, যেন অম্বি ভুল না বোঝে।

বাইরের বারান্দায় আগন্তুক এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরের সাড়া পেয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন উপেন। চারুবালা বলেন—বোধ হয়, মেজমামা এসেছেন।

চারুবালার মেজমামা অর্থাৎ উপেনের মামাশ্বশুর এসেছেন। উপেন আর চারুবালা বাইরে এসে অভ্যর্থনা জানালেন। হলঘরে বসে মেজমামাও নানা কুশল প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন, কই তোমার মেয়েরা কই ?

চারু—মেয়েরা তো নয়, একটি মেয়ে।

মেজমামা—আর সেই পালিতা মেয়েটা ?

চারু—হ্যাঁ, সেও আছে।

মেজমামা—ডাক, একবার দেখে যাই ওদের।

রমা আর অম্বি এসে প্রণাম করে চারুবালার মেজমামাকে। মেজমামা সস্নেহে রমার একটা হাত ধরে বলেন—এটা বুঝি তোমার সেই পালিতা মেয়েটা ? আর ওটি হলো তোমার আপন…?

মুহূর্তের মধ্যে অম্বির মুখের উপর দিয়ে যেন এক দুর্লভ হর্ষের দীপ্তি ঝিলিক দিয়ে চলে যায়। ভুল ক'রে যে-কথাটা বলে ফেলেছেন আম্মির মেজমামা, সেই কথাটাই যে অম্বির জীবনের স্বপ্ন।

কিন্তু দেখা যায়, মুহূর্তের মধ্যে যেন একটা পরাভবের আঘাতে অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে চারুবালার মুখ। চেঁচিয়ে ওঠেন চারুবালা—

না, ঐ তো রমা, আমার আপন মেয়ে। আর ঐ হলো অম্বি… এখন আমার মেয়েরই মত।

অম্বির দুচোখের হর্ষ আবার নিষ্প্রভ হয়ে যায়। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি, তারপর চলে যায়।

চারুবালা কথা প্রসঙ্গে নিজের মেয়ে রমার নানা গুণের কথা বলতে থাকেন। লেখাপড়ায় ভাল, থার্ড ইয়ার, ইংরেজীতে অনার্স নিয়েছে। স্পোর্টসে প্রাইজ পায়, ডিবেটে আর আবৃত্তিতে প্রাইজ পায়। ভাল গাইতে পারে, ক্র্যাফট্‌স্ শিখেছে নানা রকম।

রমা আপত্তি করে এবং মায়ের মুখে তার এই প্রশংসার কীর্তন শুনে লজ্জাও পায়। কিন্তু চারুবালা বলেন—রমার জন্য একটি ভাল পাত্র আপনি খোঁজ করুন মেজমামা।

পরমুহূর্তে অন্য ঘরে গিয়ে একটা আলমারি থেকে কতগুলি এমব্রয়ডারি আর লেসের কাজ তুলে নিয়ে এসে মেজমামার চোখের সামনে তুলে ধরেন চারুবালা।—আপনি দেখুন মেজমামা। নিজের মেয়ে বলে বাড়িয়ে বলছি না। রমার হাতের কাজ কত সুন্দর দেখুন।

চেঁচিয়ে ওঠে রমা—এগুলি আমার তৈরী নয় মা।

—তোর নয়? তবে কার?

—অম্বি করেছে!

—অম্বি? অম্বিকে কে শেখালো? তুই?

—না, নিজে শিখেছে।

—নিজে শিখেছে? তোর দেখাদেখি?

—আমি কিন্তু কোনদিন দেখিয়ে দিই নি।

অপ্রসন্নভাবে চুপ ক'রে এবং মনের ভিতর পরাভবের ক্ষোভ কোনমতে সংযত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন চারুবালা। মেজমামা আশ্বাস দিয়ে গেলেন, উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করবেন।

তার পরেই অন্য ঘরে অম্বির কাছে গিয়ে যেন একটা চাপা

আক্রোশ চরিতার্থ করার জন্য উপস্থিত হলেন চারুবালা।—এসব
তুই শিখলি কবে ?

—অনেকদিন আগেই।

—তবে লুকিয়ে রেখেছিলি কেন ? আমাকে বলিস নি কেন ?

উত্তর দেয় না অম্বি। চারুবালা মন্তব্য করে—বুঝেছি।

অম্বি ছলছল চোখে বলে—কি বুঝলে আম্মি ? আমি কিন্তু···

কিন্তু ক্ষুব্ধভাবেই অম্বির আদুরে ভঙ্গীর প্রশ্ন আর কাতর স্বর উপেক্ষা ক'রে উপেনের কাছে এসে তর্ক বাধিয়ে বসেন চারুবালা। —সমস্যা খুবই খারাপ দিকে গড়াচ্ছে।

—কি ?

—রমাকে হিংসে করতে আরম্ভ করেছে অম্বি।

মেজমামার মন্তব্য শুনেই চারুবালার সংস্কারের গর্ব আহত হয়েছিল। তাঁর নিজের মেয়েকে পালিতা মেয়ে বলে বোধ হয়েছে মেজমামার, আর অম্বিকে আপন মেয়ে। অম্বির মুখের হাসিটাও লক্ষ্য করেছেন চারুবালা। অভিযোগ করেন চারুবালা—দেখলে তো, ওর মনে বিষ ঢুকেছে।

উপেন বলেন—অম্বিকে দোষ দিচ্ছ কেন ? বল, মেজমামার চোখে বিষ আছে।

—কেন ?

—আমরা ওকে মেয়ের মত বলছি, কিন্তু পৃথিবী যে সেটা বুঝতে চাইছে না।

চারু—তুমি বলতে চাও, ভুল করছে পৃথিবীর মানুষ, অম্বি নয় ?

হতাশভাবে উপেন বলেন—কে জানে ?

উপেন আর চারুবালার আলোচনায় আবার নানারকম সতর্কতার সিদ্ধান্ত একে একে দেখা দিতে থাকে। লোকে যেন

ভুল না বোঝে, যেন পৃথিবীর চোখের দৃষ্টি মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিতে পারে, রমা হলো আপন মেয়ে, আর অম্বি মেয়ের মত। এইবার পৃথিবীর চোখের সামনেই অম্বিকে নিজেদের কাছ থেকে, এই পরিবারের অন্তরের বৃত্ত থেকে একটু ভিন্ন ক'রে না রাখলে ভুল করবে সবাই, আর অম্বির মনও মিথ্যা গর্বে ও বিশ্বাসে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যাবে।

অম্বিকে স্পষ্ট করেই বলে দিলেন চারুবালা—ওসব কাজ তোমার সাজে না, দরকারও নেই। রমা যা করবে, তোমাকে তাই করতে হবে, এর কোন মানে নেই। মেজমামার কাছে আমাকে যেরকম নাকাল করলে, এরকম যেন আর কখনো আমাকে করো না।

লেসের বোঝা একটা আবর্জনার পিণ্ডের মত পাকিয়ে নিয়ে চুপ ক'রে ঘরের একান্তে বসে থাকে অম্বি। ছটফট করে। তার পর আলমারির মাথার উপরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সেই লেসের স্তূপ বিছানার উপর শুয়ে পড়ে অলসভাবে, বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে অম্বি।

অম্বি আর ভুল করতে চায় না। বুঝেছে অম্বি, আপ্পি আর আম্মির মনের দুঃখটা কোথায়? রমার পক্ষে যে কাজ সাজে, অম্বির পক্ষে সে কাজ সাজে না। রমার সঙ্গে যেন কোন কাজের তুলনার মধ্যে পড়তে না হয়। রমা যে-সব কাজ করে না, এইবার থেকে মাত্র সেই সব কাজের মধ্যে হাত দুটোকে উৎসর্গ ক'রে দিতে হবে। আর, আপ্পি ও আম্মি যেন কখনো বুঝতে না পারেন, কোন দুঃখ আছে অম্বির মনে।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসে অম্বি। ঘর থেকে বের হয়। তারপর এঘর থেকে ওঘর ঘুরে কাজ করতে থাকে। মনে পড়ে, চোখে দেখতে পায়, আপ্পির জুতোগুলিতে পালিশ নেই। বিকেল হয়েছে, বেড়াতে বের হবেন আপ্পি। অম্বি ব্যস্তভাবে আপ্পির জুতোতে পালিশ লাগাতে থাকে।

রমা সাজ-সজ্জা সেরে ব্যস্তভাবে এসে অম্বিকে দেখে বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে—এ কি, তুই এখনো এসব করছিস কি? বেড়াতে যাবি না?

—আমি বেড়াতে যাব না।

—তার মানে?

—তারমানে বেড়াতে আমার ভাল লাগে না।

বাইরের ঘরে গিয়ে উপেনের পায়ের কাছে জুতো জোড়া এগিয়ে দিয়ে অম্বি বলে—ও জুতো রাখ। এটা পরো।

চারুবালা আসেন। রমা চিৎকার করে—অম্বি এরকম বদ-মাইশি করছে কেন?

—কি?

—বলছে, বেড়াতে যাবে না।

—নাই বা গেল, তুই একা যা।

রমা আপত্তি করে—আমি একা যাব না।

অম্বিব মুখের দিকে তাকিয়ে রমা বলে—তুই না বলেছিলি, গঙ্গার ঘাটে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে?

অম্বি—হ্যাঁ বলেছিলাম, তাতে হয়েছে কি?

—তবে এখন যাবি না বলছিস কেন?

চারুবালা বলেন—যাবে না ওর ইচ্ছে, তুই জবরদস্তি করছিস কেন?

রমা—তাহলে আমাবও যেয়ে কাজ নেই।

চুপ ক'রে থাকেন চারুবালা আর উপেন। তারপর যেন অনিচ্ছার সুরে চারুবালা অম্বিকে বলেন—তবে তুইও যা।

ঘরের ভিতরে গিয়ে এক মিনিটের মধ্যে ফিরে আসে অম্বি। অম্বির সাজ দেখে চমকে ওঠেন উপেন আর চারুবালা। একটা সাধাবণ মিলেব শাড়ি, আঁচলটা আবার ছেড়া, যেন ইচ্ছে করেই রুক্ষসুক্ষ একটা মূর্তি ধারণ ক'রে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অম্বি।

রমা প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে অম্বিকে ধমক দিতে থাকে। অম্বির ভাঙ্গা বেণীটাকে নাড়া দিয়ে, আভরণহীন কানটাকে টিপে আর ছেঁড়া আঁচলটাকে দোলা দিয়ে রমা বলে—আমি যাব না, তোর সঙ্গে যেতে আমার ঘেন্না করছে।

মা ও বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে অভিযোগ করে রমা—তোমরা ওকে এত লাই দিচ্ছ কেন? কিছু বলছ না যে?

নিরুত্তর হয়ে এদিক-ওদিক মুখ ক'রে তাকিয়ে থাকেন চারুবালা ও উপেন।

অম্বি হেসে ফেলে, আর রমাকে পাল্টা ধমক দিয়ে বলে—তুই বেশি বাজে বকিস না' চল আম্মি।

যাবার সময় চারুবালাকে বলে যায় অম্বি—দুধ জ্বাল দেওয়া হয় নি এখনো, রাঁধুনী-দিদিকে মনে করিয়ে দিও আম্মি।

অম্বির ভালর জন্যই এই রকম কঠোরতা করতে হয়েছে। এই ধারণা আছে বলেই কঠোরতা করতে পারলেন চারুবালা। কিন্তু, তবু উদাস দৃষ্টি মেলে পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। উপেনের পাশে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে দুটি মেয়ে, একটি নিজের মেয়ে, আর একটি পরের মেয়ে। চারুবালার চোখের দৃষ্টি কাঁপতে থাকে, যেন নিজের এই কঠোরতাকেই সহ্য করবার শক্তি খুঁজছেন তিনি।

চাকর এসে প্রশ্ন করে—আপনি যে এখন বের হবেন বলেছিলেন মা, ট্যাক্সি ডাকবো?

মনে পড়ে চারুবালার, শ্যামবাজারে পিসিমার বাড়িতে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন।

ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখতে পান চারুবালা, ড্রেসিং আলমারির পাশে টুলের উপর রাখা আছে একটা নতুন তাঁতের শাড়ি, ব্লাউজ, মেঝের উপর ভেলভেটের একজোড়া চটি।

আম্মির জন্যই রেখে দিয়ে গিয়েছে অম্বি। কিন্তু দেখতে পেয়ে

চারুবালার দুই চোখে যেন জ্বালা লাগে। কিন্তু ভয়ংকর একটা বিদ্রূপকে সাজিয়ে রেখে গিয়েছে মেয়েটা! অম্বির নাম ক'রে নিন্দা বর্ষণ করেন।—মেয়েটা যেন আমাকে জব্দ করার জন্যই জন্মেছে।

শেষ পর্যন্ত নতুন তাঁতের শাড়ি ঠেলে সরিয়ে রাখলেন চারুবালা। চাকরকে বললেন—আমি যাব না।

ফটকে গাড়ি এসে থামে। গাড়ি থেকে নেমে আসেন শ্যামবাজারের পিসিমা, সঙ্গে এক যুবক।

শ্যামবাজারের পিসিমা এর আগেও কয়েকবার এসেছেন ব্যারাকপুরের এই বাড়িতে। পিসিমার সংসার খুবই ছোট, একমাত্র নাতি ঐ অধীরই হলো পিসিমার যত স্নেহ উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার দায়। একবার কেদার-বদরী ঘুরে আসবেন, কিন্তু তার আগে নাতির বিয়ে দিয়ে সংসার থেকে দায়মুক্ত হতে চান পিসিমা। তাই কেদার-বদরীর আহ্বান বার বার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কারণ অধীর কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না। শুধু বই-পত্র আর লেখা-পড়া নিয়ে যেন একটা খামখেয়ালের জগতে বাস করছে অধীর। পিসিমার মনে এটা একটা দুঃখ। অনেক কোম্পানির কাগজ আছে পিসিমার। মাঝে মাঝে রাগ ক'রে বলেন পিসিমা—যদি বিয়ে না করিস, আমি আর মাত্র একটি বছর দেখবো, তার পর হাসপাতালে সব সম্পত্তি দান করে দেব। পিসিমার হুমকি এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে পার করে দেয় অধীর। অধীরই পাল্টা বিদ্রূপ করে, আমি বিয়েও করবো না, আর তোমার সব কোম্পানির কাগজও খাব।

পিসিমা বলেন—ওটি হবে না।

পিসিমার সকল কথার মধ্যে কয়েকটি আগ্রহ সব চেয়ে বেশি

প্রবল, এবং নিত্যদিন তাই নিয়েই আলোচনা করেন, বাড়ির ঝির সঙ্গে কিংবা সরকার মশাই-এর সঙ্গে। এক হলো বংশের গর্ব, দুই কেদার-বদরী যাবার আকাঙ্ক্ষা, তিন অধীরের বিয়ের জন্য চিন্তা। একটি বড় ঘর চাই, বড় ঘরের সুন্দর ও সুশিক্ষিতা একটি মেয়ে চাই। তাই পিসিমার এটা একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রতিদিন খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন পাঠ করেন। কিন্তু কোন পাত্রীই পছন্দ হয় না। প্রতিদিন অধীরকে একবার রাজী করাতে চেষ্টা করেন—বিয়ে করবি কি না বলিস?

অধীর বলে—না।

—কেন?

—ইচ্ছে হয় না।

—ইচ্ছে হলে করবি তো?

—ইচ্ছে হবে না কোনদিন।

পিসিমা বস্তুত একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছেন। অধীরের বন্ধু যারা আসে মাঝে মাঝে, তাদেরও অনুরোধ করেন, বন্ধুকে বিয়ে করতে রাজী করাও।

অধীরের বন্ধু বলতে মাত্র দু-তিন জন যারা আসে, তারাও অধীরের মতই লেখাপড়ার জগতে বাস করে। সকলেই রিসার্চ-স্কলার। ওদের মন পড়ে থাকে দূর বেলভেডিয়ারের ন্যাশনাল লাইব্রেরিব গ্রন্থরাজ্যের মধ্যে। কেউ ইতিহাস, কেউ ভাষা, এবং কেউ বা সমাজতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে। পিসিমার অনুরোধ শুনে অনেকেই বিচলিত হয়, এবং অধীরকে অনুরোধও করে—তুমি বিয়ে করে ফেল অধীর।

অধীরের উত্তরে সেই এক কথা।—যেদিন ইচ্ছে হবে।

—কবে ইচ্ছে হবে?

—তা বলতে পারি না। মোট কথা মেয়েদের সম্বন্ধে আমার ধারণা ভাল নয়।

বন্ধুরা হাসে। এই ধরনের আলোচনার জের মাঝে মাঝে ন্যাশনাল লাইব্রেরির কক্ষে এবং বারান্দার উপরে স্কলার বন্ধুদের এক ছোট সমাবেশের মধ্যেও দেখা দেয় এবং গ্রন্থ-রাজ্যের শুষ্কতার মধ্যে সরসতার ছোঁয়াও লাগে।

বেশী নয়, সংখ্যায় ছয় জন মাত্র। ন্যাশনাল লাইব্রেরির গ্রন্থরাজ্যের মধ্যে একটি অন্তরঙ্গ সমাবেশ গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে প্রৌঢ় সৌম্যমূর্তি ডক্টর ব্যানার্জিও আছেন। আর সবাই যুবক। এক একটি কক্ষে নোটবই ও পেন ও বিপুল গ্রন্থের স্তূপ নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই সকলে অধ্যয়ন ক'রে চলে যান। কুশল প্রশ্ন, পারিবারিক সংবাদ এবং বিশেষ ক'রে নিজের নিজের গবেষণার বিষয় নিয়ে সকলের মধ্যে বেশ একটি অন্তরঙ্গ আলোচনা চলে। পড়া শেষ হলে, কখনো অধীরের কক্ষে, কখনো ডাঃ ব্যানার্জীর কক্ষে, এবং কখনো বা বারান্দায় অথবা লনের উপর একটি আলাপমুখর আড্ডা দেখা দেয়। অধীরের গবেষণার বিষয় হলো—এভ্রি ম্যান ইজ বর্ন ইকোয়্যাল।

রুশো বলেছেন, এভরি ম্যান ইজ বর্ন ফ্রি। কিন্তু অধীর প্রমাণ করতে চায়, শুধু ফ্রি নয়, ইকোয়্যাল, জন্মগত কোন সংস্কার বলেও কিছু নেই। হেরিডিটি একটা ভূয়া থিওরি। কাস্ট একটা অতি মিথ্যা, ব্লাড কোন সংস্কারেরই ধাবক নয়। এমন কি আপন-পর সম্পর্ক, আত্মীয়তাবোধ, এগুলিও হলো অবস্থার সৃষ্টি। রক্তের বন্ধন, নাড়ির টান—এসবই ভূয়ো।

গোঁড়া হিন্দু পরিবারের ছেলে অধীর। পিসিমাই গর্ব ক'রে বলে থাকেন যে, সাত পুরুষ ধরে কুলীন ছাড়া অন্য কোন নীচু ঘরে এই পরিবারের কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নি।

অধীরের মনে যেন একটা ভয় আছে, বংশগত আভিজাত্যের ঐ সংস্কারকে কোনদিন বিশ্বাস না ক'রে বসে অধীর? তাই বন্ধুদের

বলে, আমার এর রিসার্চ ডক্টরেট পাবার জন্য নয়, আমি আমার নিজের মনকেই বোঝাচ্ছি।

—এখনো কি বুঝতে পার নি?

—একটু বাকি আছে।

হ্যাঁ, একটু বাকি আছে, আজও একেবারে সন্দেহহীন হতে পারে নি অধীর। পাণ্ডিত্যের দ্বারা যে সত্য প্রমাণিত হচ্ছে, সেই সত্যকে আজও যেন অনুভব করতে পারছে না অধীর। একটা খটকা যেন অলক্ষ্যে মনের ভিতর রয়ে গিয়েছে। স্কলার বন্ধুদের কাছে সেই কথাও বলে অধীর।—আর একটি প্রমাণ চাই, তবেই আমার গবেষণার শেষ হবে। এমন একটি প্রমাণ, এমন একটি তথ্য, যে তথ্য অধীরের মনের খটকার অবশেষটুকু চূর্ণ ক'রে দিয়ে বিস্ময় আর বিশ্বাসে ভরে দেবে মন।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে এক নিগ্রো দার্শনিকের সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেই ঘটনার বিবরণ পাঠ ক'রে আশ্বস্ত হয় অধীরের মন। এই নিগ্রো দার্শনিকও চিকাগো ধর্মসভায় ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানগভীর সুন্দর এক ভাষণ দিয়েছিলেন। আফ্রিকার উপকূলে এক অরণ্যময় প্রান্তে এই নিগ্রো দার্শনিকের শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। শত্রুপক্ষের আক্রমণে পরাজিত হয়ে গোষ্ঠীশুদ্ধ সকলের সঙ্গে বালকও রজ্জুবদ্ধ হয়ে জঙ্গলের প্রান্তে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়েছিল। অগ্নিকুণ্ড জ্বলছিল পাশে। শত্রুপক্ষ দামামা বাজিয়ে উল্লাসে নৃত্য করছিল। আর কিছুক্ষণ পরেই সকল বন্দীর সঙ্গে বালককেও পুড়িয়ে মারবে জয়ী শত্রুর দল। জয়ী ও পরাজিত, দুই গোষ্ঠীই নাকি উগ্র নরখাদক সমাজের মানুষ। দৈব অনুগ্রহে পালিয়ে যাবার সুযোগ পেল বালক। হাত-পায়ের বাঁধন যেন হঠাৎ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। শত্রুর অগোচরে পালিয়ে এসে উপকূলের নিকটে শ্বেতাঙ্গ দাস-ব্যবসায়ীদের একটি জাহাজ দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিল বালক। ক্রীতদাস হয়ে আমেরিকায় চালান

হলো। সেই নরখাদক অরণ্যচারী মানুষের বংশজ নিগ্রো বালকই হলো সেই দার্শনিক।

কিন্তু তবু সন্দেহ থাকে। হেরিডিটি, বংশজ গুণ ও শোণিতের সংস্কার কি সত্যই মিথ্যা? ইউনেস্কোর রিপোর্ট পাঠ ক'রে আর একদিন আর একবার বিস্মিত ও সেই সঙ্গে আশ্বস্ত হয় অধীর। ইউনেস্কোর তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে, রেসিয়্যাল ট্যালেণ্ট বলে কিছু নেই। প্রতিভা জাতিগত নয়। রক্তের মধ্যে উত্তম ও অধম কোনো জাতিভেদ নেই। তবু যেন মনে একটা সংস্কারের ছায়া ছটফট করে—সাতপুরুষের বংশগর্বে লালিত গোঁড়া হিন্দুর মন একটা প্রত্যয় খুঁজে পেতে চায়, সে এই গ্রন্থরাজ্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। নানা অরফ্যানেজ ঘুরে বংশগত সংস্কারের সত্যতা বা মিথ্যার বিচার করেছে অধীর, কিন্তু তাতেও নিঃসংশয় হতে পারে না।

খবরেব কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন পাঠ করতে করতে সেদিন চমকে উঠলেন পিসিমা—এ কি, উপেনই যে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। কই আমাকে তো একদিনও বলে নি।

উপেনের মেয়ে রমার কথা মনে পড়ে পিসিমার। এই তো উপযুক্ত মেয়ে। অনেকদিনের আগের মনের আশাটাকেও নতুন ক'রে মনে পড়ে। অনেকদিন থেকে মনে মনে এই কথাটাই বুঝে এসেছেন পিসিমা, রমা যেমন উপযুক্ত মেয়ে তেমনই উপযুক্ত ঘব—পালটি ঘর। পিসিমা জানেন, উপেনরাও সাতপুরুষ কুলীন ছাড়া অন্য কোন নীচু ঘরে কাজ করে নি!

উপেনের মেয়ে রমার সঙ্গে যদি অধীরের বিয়ে দেওয়া যায়, তবে সব দিক দিয়েই ভাল হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই পিসিমার। চেনা ঘর, দূর সম্পর্কে কুটুম্বও বটে। কিন্তু রাজী হবে কি খামখেয়ালী নাতিটা?

বাড়ির ঝি-র সঙ্গে আলাপ ক'রে পিসিমা তাঁর নিজের মনের ধারণাই প্রকাশ করেন, যদি একবার উপেনের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে

ছোঁড়াটাকে ফেলতে পারি, তবে বুঝলে বটার মা, আজকালকার ছেলেদের তো চিনি। মেয়ের মুখের একটি কবিতা শুনলেই হয়ে যাবে।

কিন্তু যে একরোখা ছেলে, নিয়ে যাওয়া যায় কি ক'রে?

অনেক চেষ্টা ক'রে, আর অনেক বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত অধীরকে রাজী করালেন পিসিমা। ওরে, উপেন হলো তোর বাবার বন্ধু, তোর একটা ভদ্রতা থাকাও তো উচিত। আমি এর মধ্যে সাত দিন ঘুরে এলাম, তুই একদিনও গেলি না। ওরা কি ভাবলে বল দেখি?

অধীর—উপেনবাবুর বাড়িতে মেয়ে-টেয়ে আছে নাকি?

পিসিমা—থাক না, তাতে তোর কি?

অধীর—তাতে তোমার কথার মানেটা বুঝতে পারতাম, এই আর কি!

পিসিমা রাগ করেন—তোকে সাধছে কে? আমি কেদার-বদরী চলে যাচ্ছি, আর কোম্পানির কাগজ হাসপাতালে দান করে দেব।

অধীর হাসে—চল।

চারুবালাকে প্রণাম করে অধীর। পিসিমা চারুবালার সঙ্গে যে আলোচনা করতে চান, সে-আলোচনা অধীরের সম্মুখে চলে না। পিসিমা অধীরকে বলেন—তুই ওঘরে বসে বই-টই দেখ দাদু। আমরা একটু সংসারের কথা বলি।

রমার পড়ার ঘরে প্রবেশ করে অধীর এবং সত্যিই বই ঘাঁটতে থাকে। বই-এর পৃষ্ঠায় নাম লেখা—রমা রায়।

এদিকে পিসিমা ও চারুবালার আলোচনা অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। পিসিমা বলেন—খবরের কাগজে দেখলুম, মেয়ের বিয়ে দিতে চাও।

কিন্তু আমার ধারণা ছিল, রমা পাশ না করার আগে রমার বিয়ে দেবে না। তাই আমি কিছু বলি নি, নইলে আমারও অনেকদিন থেকে ইচ্ছে ছিল কথাটা পাড়ি।

চারুবালা—খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি অম্বির জন্য।

পিসিমা হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে যান—অম্বির জন্য? তাই বল, তবে বৃথাই এলুম।

চারুবালার আগ্রহে পিসিমা সবিস্তার বর্ণনা করেন, অধীরের কথা। বিবরণ শুনে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন চারুবালা—আপনি এতদিন কেন বলেন নি পিসিমা? আপনার নাতি, তায় আবার এত গুণের ছেলে, এরকম পাত্র পেলে এখুনি রমাকে পার ক'রে দিই। পাশ করবে না হয় পরে।

পিসিমা—তাহলে বল? উপেন রাজী হবে তো?

চারু—খুব রাজী হবে। ভাগ্যি ভাল বলতে হবে, যদি এই বিয়ে হয়।

পিসিমা—কিন্তু একটা সমস্যা আছে। ছেলেকে রাজী করানো। তবে আমাব বিশ্বাস কি জানো? রমাকে একবার দেখলে মন ফিরে যাবে। তাই ওকেই সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আর তোমাদেরও বলি, অধীরকে তোমরাও মাঝে মাঝে ডেকো।

—নিশ্চয়ই ডাকবো।

—কিন্তু রমা কোথায়?

—এই এল বলে, আর একটু অপেক্ষা করুন।

সঙ্গে সঙ্গে বাইরের বারান্দায় কতগুলি পদধ্বনির সাড়া শোনা যায়। উপেন এসে ঘরে ঢোকেন।

কিন্তু রমা আর অম্বি দুজনেই যেন নিজেদের মনের উল্লাসে কলরব জাগিয়ে আর হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে রমার পড়ার ঘরে।

পিসিমা এবং চারুবালা যে-রকমের ঘটনা তৈরি করতে চাইছিলেন, তাই হলো। রমার পড়ার ঘরে এক অপরিচিত যুবক

বসে আছে, কল্পনা করতে পারে নি রমা আর অম্বি। দুজনেই ঘরের ভিতর ঢুকে অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

রমা প্রশ্ন করে—আপনি কাকে চান ?

অধীর—কাউকেই না। আমার দিদিমা এসেছেন এই বাড়িতে।

অন্য ঘরে, উপেনকে দেখেই পিসিমা প্রশ্ন করেন—রমা কোথায় ?

—রমা আর অম্বি ঐ ঘরে।

চমকে ওঠেন পিসিমা। অপ্রসন্নভাবে ভ্রুকুটি ক'রে বলেন—অম্বি আবার ওঘরে গেল কেন ?

চারুবালাও একটু বিচলিত হন। তিন অভিভাবক একসঙ্গেই ব্যস্তভাবে উঠে রমার পড়ার ঘরে প্রবেশ করেন। পিসিমার নির্দেশে উঠে এসে উপেনকে প্রণাম করে অধীর। তারপর আলাপ আর প্রশ্নের পালা চলতে থাকে। উপেনের প্রশ্নে অধীর বলে—একটা চাকরিও করছি, আর রিসার্চও করছি।

চারুবালা বলেন—রমার জন্মদিন আসছে, সেদিন তোমাকে আসতেই হবে।

উপেন—শুধু জন্মদিনে কেন, রোজ আসবে, তুমি অবনীর ছেলে, বলতে গেলে আমাদের আপন জন।

অধীর—রমা কে ?

চারুবালা রমাকে দেখিয়ে দিয়ে পরিচয় শোনান—ঐ আমার মেয়ে রমা, থার্ড ইয়ার চলছে, ইংলিসে অনার্স নিয়েছে। ডিবেটে প্রাইজ পেয়েছে, স্পোর্টসে প্রাইজ পেয়েছে।

দ্বিধাগ্রস্তভাবে অম্বির দিকে তাকিয়ে একবার আমতা আমতা ক'রে কি যেন বলতে চেষ্টা করেন চারুবালা, তার পরেই বলে ফেলেন—ঐ হলো অম্বি, আমাদের মেয়ের মতই।

অম্বির মুখের উপর যেন অদৃশ্য এক চাবুকের আঘাতের জ্বালা এসে লেগেছে। মুখ ঘুরিয়ে নেয় অম্বি। পিসিমা উপেক্ষাভরে

অম্বির দিকে একবার তাকান। তাঁর ইচ্ছে অম্বি এখানে না থাকলেই ভাল।

অম্বিরও বোধ হয় হঠাৎ মনে পড়ে যায়, ভুল হচ্ছে অম্বির। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা অম্বির পক্ষে সাজে না। এই মেলামেশার আসরে অম্বির কোন কাজ নেই। যে কাজ অম্বিকে এখন করতে হবে, সেই কাজ মনে পড়ে যায় অম্বির। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে যায় অম্বি, এবং ঠাকুরকে চা তৈরি করতে নির্দেশ দেয়।

চায়ের কাপ নিজের হাতে নিয়ে পড়ার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে ডাক দেয় অম্বি—আম্মি।

চারুবালা বের হয়ে আসেন। অম্বির মুখের দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে থাকেন। অম্বির হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে চলে যান। —কি হলো আম্মি? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে অম্বি। কিন্তু কোন উত্তর দেন না চারুবালা। এবং ঠাকুরের কাছ থেকে অন্য কাপ চা নিজের হাতে নিয়ে চারুবালা ফিরে আসেন, এবং অধীরের হাতে তুলে দেন। অম্বি স্তম্ভিতের মত বারান্দার আর এক প্রান্তে উদাস ও আনমনার মত চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝতে চেষ্টা করে—আবার কোথায় ভুল হলো?

পিসিমা আর অধীর বিদায় নিল। চারুবালা বলেন—তুমি তো আমাদের একেবারে পর নও অধীর। এস মাঝে মাঝে। নিকট জন বলতে আমাদের আর কজনই বা আছে?

সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। মনটা ভালই ছিল চারুবালার। অধীর ছেলেটিকে খুবই পছন্দ হয়েছে। উপেনও বার বার এসে চারুবালার সঙ্গে আলোচনা করেন; এবং কথাপ্রসঙ্গে আশাও প্রকাশ করেন—খুবই ভাল হয়, যদি অধীরের সঙ্গে রমার বিয়ে হয়।

চারুবালা আরও উৎফুল্লভাবে আশা প্রকাশ করেন—হবে না কেন? রমাকে দেখে অপছন্দ হবার তো কোন কারণই নেই।

উপেন আবার আবৃত্তি করেন সেই কথা—রমাকে নিয়ে তো কোন সমস্যা নেই, সমস্যা হলো অম্বিকে নিয়ে।

চারুবালা বলেন—রমার বিয়ের আগেই যদি অম্বির একটা গতি হয়ে যেতো, তবে বেশ হতো। বয়সে অম্বিই তো বড়, অন্তত মাস ছয়েক তো বটেই।

উপেন—আমার মনে হয়, অম্বিও এখন সমস্যাটা বুঝতে পারছে, এখন তো আর সেই পাঁচ বছর বয়সের সেই মধুপুরের বাসার একটা বাচ্চা নয়। বড় হয়েছে, বুঝতেও পারছে। শুধু ভয় হয়, আমাদের যেন ভুল না বোঝে।

চারুবালা—কি ভুল করেছি যে আমাদের ভুল বুঝবে?

উপেন উত্তপ্ত স্বরে বলেন—এই যে আজ কাণ্ডটা হলো। মেয়েটাকে একটা ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে সারা রাজ্যি ঘুরিয়ে আনা হলো।

চারুবালার মেজাজও উত্তপ্ত হয়—তুমি আমাকে খোঁটা দিচ্ছ মনে হচ্ছে!

উপেন—খোঁটা দিচ্ছি আমার অদৃষ্টকে। ছিঃ।

চারুবালা বিরক্তভাবে ঘর ছেড়ে চলে যান। যেতে যেতে মন্তব্য করেন—আমি লাই দিতে পারবো না, পরের মেয়েকে মাথায় নিয়ে থাকতে পারবো না।

চারুবালার মনের একটা ভয় এইবার চারুবালাকে সত্যই মাত্রাছাড়া ভাবে কঠোর ক'রে তুলেছে। পিসিমা সবই জানেন, কোন্ এক জঙ্গলের কোন্ এক অন্ত্যজ কুলি পিতা-মাতার সন্তান হলো অম্বি। পিসিমা এই বাড়ির ধুলো মাড়ান, এই তাঁর যথেষ্ট কৃপা। অম্বি আছে বলেই পিসিমা এই বাড়ির জল খান না। তবু সব সহ্য ক'রে আর ক্ষমা ক'রে, এই বাড়ির মঙ্গলের জন্যই রমাকে ঘরের বউ ক'রে নিয়ে যেতে চান পিসিমা। অধীরের সঙ্গে রমার

বিয়ের প্রস্তাব এই মুহূর্তে ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি অধীর জানতে পারে যে, জাতপাতের সংস্কার তুচ্ছ ক'রে এই বাড়ির মানুষগুলি এক অন্ত্যজ মেয়েকে নিয়ে স্নেহের আর আদরের মাখামাখি করছে। বড় বংশের ছেলে অধীরের মনে বড় সংস্কার থাকবে, এ তো খুব স্বাভাবিক। কিন্তু পিসিমা সহায় আছেন, তাই ও সমস্যা দেখা দেবে না। অম্বির জাতের কথা জানতেও পারবে না অধীর।

বারান্দা দিয়ে নিজের মনের উষ্মায় মন্তব্য করতে করতে চলে যাচ্ছিলেন চারুবালা, হঠাৎ সেই মন্তব্যের আঘাতে বারান্দার এক-প্রান্তে একটি ছায়া নড়ে ওঠে। পরের মেয়ে—কথাটা শুনতে পেয়ে চমকে উঠেছে অম্বি।

—আম্মি? তীব্রস্বর আর্তনাদের মত আহ্বান শুনে থমকে দাঁড়ান চারুবালা। ডাক দিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অম্বি। অম্বির চোখে মুখে অদ্ভুত একটা শাণিত কৌতূহল ছটফট করছে। এরকম অশান্ত হতে অম্বিকে কখনো দেখেন নি চারুবালা।

—আমি কে আম্মি?

এত কঠোর আর এত স্পষ্ট একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না চারুবালা। প্রশ্ন শুনে হঠাৎ চমকে এক পা পিছিয়ে সরে দাঁড়ান চারুবালা। অম্বি বলে—কোনদিন বল নি, আজ বলতেই হবে। আমি না শুনে ছাড়বো না।

—তোর তো বড় সাহস বেড়েছে অম্বি।

—বল, আমি না শুনে ছাড়বো না।

—কি শুনতে চাস?

—আমার ছোঁয়া চা কি বিষ?

চারুবালা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন—বুঝেছি, বেশ বুদ্ধি রেখে ঝগড়া করতে শিখেছিস তো?

চিৎকার করে অম্বি—বল, আমি কে, আমার ছোঁয়া চা মানুষে খাবে না কেন?

মেজাজ হারিয়ে উত্তপ্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠেন চারুবালা—তুই ছোট জাত। সে জাতের ছোঁয়া ভদ্রলোকে খায় না, সে জাতের দরজা মাড়ায় না ভদ্র জাতের মানুষ।

—আমার জাত ছোট কেন হলো ?

—ছোট-জাতের বাপ-মা'র ঘরে জন্মেছিস, তাই।

—কোথায় সেই ছোট জাতের বাপ-মা।

—নেই, পৃথিবীতে নেই। থাকলে তুই আর আমার বোঝা হয়ে···।

চারুবালার হাত ধরেছিল অম্বি, শক্ত ক'রে। হাত ছাড়িয়ে চলে যান চারুবালা। গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, উগ্র চোখের দৃষ্টি হঠাৎ জ্বালায় ছলছল ক'রে ওঠে। ছটফট ক'রে চলে যান চারুবালা। অম্বি একটা ভাঙ্গা মূর্তির মত মেজের উপর লুটিয়ে পড়ে।

নিজের ঘরে বিছানার উপর শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকেন চারুবালা। উপেন এসে বলেন—তুমি ওসব কথা ওকে কেন বলতে গেলে ? কি লাভ হলো?

কোন উত্তর দেন না চারুবালা। ঠাকুর এসে বলে—অম্বিদি বললেন, খাবেন না।

উপেন—অম্বি খায়নি এখনো ?

ঠাকুর—না।

চারুবালা উঠে বসে—তোমরা খেয়েছ ?

উপেন—হ্যাঁ, আমি খেয়েছি।

ঠাকুর—রমাদিও খেয়েছেন।

চারুবালা ঠাকুরকে বলেন—আমি খাব না।

ঠাকুর কুণ্ঠিতভাবে চলে যায়।

উপেন—নাঃ, আমার আর এসব ভাল লাগে না। উদ্‌ভ্রান্তের মত আর আক্ষেপের সুরে বলতে বলতে চলে যান উপেন।

কিছুক্ষণ পরেই চারুবালা ওঠেন। রান্নাঘরে ঠাকুরকে থালাতে খাবার সাজাতে বলেন। নির্দেশ দেন—নিয়ে এস।

অম্বির ঘরে ঢুকে ডাক দেন চারুবালা—অম্বি।

অম্বি ধড়ফড় ক'রে উঠে বসে। চোখে হাসি দেখা দেয়। লজ্জা পায় অম্বি। একেবারে শান্ত ও স্নিগ্ধ হয়ে যায় অম্বির চেহারা। উল্টো অনুযোগ ক'রে চারুবালাকে অম্বি প্রতিবাদ জানায়—ছিঃ, আম্মি, তুমি এসব কি করছো? আমি একটুও রাগ করি নি আম্মি।

—তা হলে খা।

খেতে বসে অম্বি। চারুবালা বলেন—আমরা তো আর তোর পর নই, তোর ছোঁয়ায় আমাদের কিছু এসে যায় না। কিন্তু বাইরের লোক, সমাজের আর পাঁচজন তো তোকে আর মায়ার চোখে দেখে না। তারা জাত বুঝে চলে।

উপেনের ছায়ামূর্তি দেখা যায়, দরজার বাইরে নিঃশব্দে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। ঘরের ভিতরের দৃশ্যটা দেখে শান্ত হয় উপেনের উদ্বিগ্ন চোখ, নিজের হাতে দুধের বাটি তুলে অম্বিকে খাইয়ে দিচ্ছেন চারুবালা।

অম্বির কাছে, একটা পরের মেয়ের কাছে এইভাবে হার মানতে মানতে চলেছে এই বাড়ির সব উষ্মা অভিযোগ সতর্কতা আর কঠোরতা। কিন্তু এখনো বোধহয় বুঝতে পারেন না উপেন আর চারুবালা, তাঁরা হার মানছেন, হার মানতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের নিজেরই অন্তরের গোপনে নিহিত একটা স্নেহান্ধতার কাছে।

তবে এইবার কিছুটা আশ্বস্তও হয়েছেন উপেন আর চারুবালা। অম্বি তার জন্ম-পরিচয় জেনেছে। এইবার বুঝেছে অম্বি। বুঝেছে আরও ভাল ক'রে নিজের অদৃষ্টকে। রমাতে আর অম্বিতে যে

পার্থক্য, সেই পার্থক্যটুকু স্বীকার ক'রে নিয়ে অম্বি নিশ্চয়ই এইবার তার ভাগ্যকে স্বীকার করে নেবে শান্তভাবেই। আম্মি আর আম্মির স্নেহকে সন্দেহ করবে না অম্বি।

সুতরাং, অম্বির বিয়ের জন্যও একটু ভাল করে চেষ্টা করতে হয়। জাতের সংস্কারে বাঁধা এই সমাজে কোথাও কোন্ উদার মানুষ আছে, যে মানুষ জাত মানে না, শুধু মানুষের মেয়ে বলে সম্মান ক'রে অম্বিকে ঘরে নিয়ে যাবে? হয়তো আছে। কিন্তু কেমন ক'রে খোঁজ পাওয়া যায়?

অনুসন্ধান করেন উপেন। আশ্রমে পালিতা মেয়েদের বিয়ে হয় কোথায়, কেমন ক'রে? খোঁজ নিয়ে আরও হতাশ হয়ে পড়েন, এবং কল্পনা করতেও ভীত হয়ে ওঠেন উপেন। চারুবালাকে আরও চিন্তিত ক'রে দিয়ে উপেন বলেন—যেখানেই খোঁজ করছি, দেখছি পাত্র আছে ঠিকই। কিন্তু একেবারে ভিন্ন ধর্মের পাত্র, যারা জাতপাত মানে না। তা-ছাড়া, আর যে-সব ব্যাপার শুনলাম, সে আরও ভয়ানক। যত নারীআশ্রম জুড়ে যত সব পাপীর দল বসে আছে। সেখানে বিয়েটা একটা কৌশল মাত্র, মেয়েগুলিকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যায়।

আতঙ্কিতভাবে তাকিয়ে থাকেন চারুবালা।—তোমাকে আর ওভাবে খোঁজ করতে হবে না। ঐ বিজ্ঞাপনই ভাল। লোক বুঝে, খোঁজ খবর নিয়ে তবে সম্বন্ধ করা যাবে।

বিজ্ঞাপনেরই সূত্রে এক প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক এসে দেখা নিলেন একদিন। পাত্রের পিতা। উপেন স্মরণ করতে পারেন না, কিন্তু আগন্তুক ভদ্রলোক বলেন—আমি ও আপনি এক কলেজেরই ছাত্র ছিলাম। নামটা এখনো স্মরণে আছে, বিজ্ঞাপন দেখেই বুঝেছি। যাক, ওসব যৌতুক-ফৌতুকের আগ্রহে নয়

আপনার মত মানুষের সঙ্গে কুটুম্বিতা হবে, মাত্র এই আগ্রহে। তাছাড়া আপনার মামাশ্বশুরের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, আপনার পরিচয় জেনে আরও আগ্রহ হলো।

হ্যাঁ, ভদ্রলোক মেজমামার কাছ থেকে উপেনের সম্পত্তির কথা শুনতে পেয়েই উৎসাহিত হয়েছেন।

ভদ্রলোক বলেন, তিনি এসব বিষয়ে অতি উদার; যৌতুক সম্বন্ধে তাঁর কোন দাবি নেই, ওটা স্বেচ্ছার ব্যাপার। দাবি করা বর্বরতা। তিনি শুধু মানুষ বোঝেন। মানুষ ভাল হলেই সব ভাল।

ভদ্রলোক কথা প্রসঙ্গে সমাজের নিন্দা করেন। এখনো কত-রকম জাত-পাতের সংস্কারে বাঁধা রয়েছে সমাজ! বংশ বড় কথা নয়, ভদ্রতা হলো বড় কথা। টাকা আসল নয়, রুচি ও শিক্ষা দীক্ষা হলো আসল কথা। আক্ষেপ করেন—কবে যে সমাজের মনে উদারতা জাগবে?

আশা জাগে উপেনের মনে। সকৃতজ্ঞ ও সপ্রশংসভাবে আগন্তুক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ ক'রে পাত্রের পবিচয় জানতে থাকেন উপেন। পাত্র সুশ্রী। পাত্র দোকান দিয়েছে, কাপড়ের দোকান, তবে একটু ক্যাপিট্যালের দরকাব হয়ে পড়েছে।

—তার জন্য কোন চিন্তা নেই।

—আমি আপনার কাছ থেকে এইরকমই আশা করেছিলাম উপেনবাবু। আপনার মেয়েকে ঘরের লক্ষ্মী ক'রে নিয়ে···।

উপেন এইবার আসল সমস্যাব কথা উত্থাপন করেন।—একটি কথা আপনাকে জানাই। পাত্রী আমার মেয়ে নয়। যার বিয়ের কথা বলছি, সে আমার মেয়েব মত।

—আজ্ঞে?···হ্যাঁ, তাতেই বা কি এসে যায়?

—আমার পালিতা মেয়ে। মেয়েটি জাতে ছোট।

—কি রকম? কুলীন ঘরের নয়?

—ছোট জাতের···বেশ একটু, যাকে বলে জল অচল জাত।

ভদ্রলোক অপ্রসন্নভাবে এবং একটু ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ান।—এরকম কথা আপনার কাছে শুনবো বলে আশা করি নি।

—সে কি ? আপনার মত সন্দেহমুক্ত, উদার চিত্ত···।

—রাখুন মশাই। তার চেয়ে যদি বলতেন, মেয়ের দুটো পা নেই···।

বলতে বলতে চলে গেলেন ভদ্রলোক।—এরকম লোকঠকানো বিজ্ঞাপন আর দেবেন না মশাই।

অসহায় অপমানিতের মত, আহত রোগীর মত অবসন্নভাবে বসে থাকেন উপেন। চারুবালা কাছে এগিয়ে আসেন।

উপেন বলেন—শুনলে তো ?

—শুনেছি। এইরকম ব্যাপাব যে দাঁড়াবে, সেটা বিশ বছর আগেই বোঝা উচিত ছিল।

—কি করা যায় ?

—ওসব ভদ্রঘরের আশা ছেড়ে দাও। আর কী সব ভদ্র ঘর, দেখছো তো ?

আশ্চর্য কবলো অধীর। পিসিমার যে প্রশ্নকে প্রতিদিনই সোজা উত্তর দিয়ে শুধু না ক'বে এসেছে অধীব, আজ সেই প্রশ্নের সম্মুখেই যেন হঠাৎ এলোমেলো হয়ে গেল অধীরের এতদিনের সংকল্পের শক্ত গ্রন্থিটা। আমতা আমতা ক'রে যে ভাষায় উত্তর দেয় অধীর, তার মোটামুটি অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বিয়ে হলে আপত্তি নেই।

তবে তো ওষুধে ধরেছে ! পিসিমার গম্ভীর মুখে হাসির ছায়া কাঁপে, এবং সেই সাফল্যের আনন্দ ঝি বটার মা'র কাছে জানিয়ে এবং অধীরকে সঙ্গে নিয়েই সোজা উপেনের বাড়িতে চলে এসেছেন পিসিমা।

—লক্ষণ ভাল, লক্ষণ ভাল। পিসিমা উৎফুল্ল স্বরে বলতে থাকেন। আমি যা ভেবেছিলাম, তাই হলো।

চারুবালা—কি ভেবেছিলেন ?

—ভেবেছিলাম, ছোঁড়াকে যদি একবার কোনমতে টেনেটুনে নিয়ে এসে রমার সামনে ফেলতে পারি, তবে ওর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কোথায় ভেসে যাবে।

পিসিমার কথায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে চারুবালার চক্ষু। উপেনও শুনে খুশী হন।

চারুবালা প্রশ্ন করেন—কিন্তু অধীর কোথায় ?

পিসিমা—অধীরও এসেছে।

সুবিজ্ঞা পিসিমা অধীরকে আর একবার রমার পড়ার ঘরে বসিয়ে, অর্থাৎ রমার চোখের সামনে বসিয়ে রেখেই ভিতরে এসেছেন।

অধীর বাইরের বারান্দায় বসতে চেয়েছিল, আর রমাকে আপনি বলে সম্বোধনও করেছিল। পিসিমাই অধীরের ভুল শুধবে দিয়েছেন —রমাকে তুই আপনি করে বলছিস কেন রে ? আপনি নয়, তুমি তুমি। তোর চেয়ে বয়সে রমা কত ছোট !

রমাও ভদ্রতা ক'রে বলেছে—বারান্দায় বসবেন কেন ?

অধীর—তোমার পড়ার ব্যাঘাত হবে।

রমা—একটুও না। আমার পড়া হয়ে গিয়েছে।

পড়ার কথা উঠতেই অধীরের পড়ুয়া জীবনের সব আগ্রহ রুচি আর ইচ্ছা যেন একটা স্বচ্ছন্দ সুযোগ পেয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। পড়ার কথা থেকে বই-এর কথা, সাহিত্যের কথা, কাব্যের কথা, সেক্সপীয়র ও শেলি পর্যন্ত আলোচনা গড়াতে থাকে।

কলেজ ম্যাগাজিনে রমার লেখা একটি কবিতার খুব প্রশংসা করে অধীর। কবিতার নাম 'চন্দ্রমল্লিকা'।

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয় অধীর। চন্দ্রমল্লিকা, এই কথাটাই যেন কয়েকদিন আগের একটি মিষ্টি গম্ভীর ও শান্ত মুখচ্ছবি চকিতে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। মনে পড়ে অধীরের, তার হাতে একটা

চন্দ্রমল্লিকা ছিল, এইঘরে এইখানে দাঁড়িয়েছিল সে। হঠাৎ চলে গেল। রমার মা যাকে বললেন তাঁর মেয়ের মত, কোথায় গেল সেই মেয়ে? সেটি কি এই বাড়িরই মেয়ে? এখানেই থাকে?

রমাকে প্রশ্ন করে অধীর—আচ্ছা, সেদিন যে আর একজনকে দেখলাম, তোমার মা যাকে বললেন মেয়ের মত···।

—অম্বির কথা বলছেন?

—হ্যাঁ।

—আস্থন।

ব্যস্ত হয়ে ওঠে রমা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে তাকিয়ে ডাক দেয়—অম্বি!

কোন সাড়া না পেয়ে, বারান্দা থেকে নেমে বাগানের এক প্রান্তের দিকে তাকিয়ে ডাক দেয়—অম্বি! দেখতে পায় রমা, অম্বি দাঁড়িয়ে আছে জলের ঝারি হাতে, চন্দ্রমল্লিকার সারির কাছে।

—আস্থন। অধীরকে ডাক দিয়ে সঙ্গে নিয়ে একেবারে অম্বির কর্মব্যস্ত মূর্তির সম্মুখে এসে দাঁড়ায় রমা। বিব্রত লজ্জিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে অম্বি। রমাই চীৎকার ক'রে অম্বির গুণের পরিচয় ব্যাখ্যা করে, এবং সেই ব্যাখ্যায় অম্বির পরিচয় যেন এক নতুন রহস্যের ফুলের মত ফুটে ওঠে। রমা বলে—আমি কবিতায় চন্দ্রমল্লিকা লিখি, আর অম্বি সত্যি সত্যি চন্দ্রমল্লিকা ফোটায়।

বিস্মিত অধীরকে আর একটু স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দেয় রমা।—এই যত সব ফুল দেখছেন, সবই ওর হাতের যত্নে তৈরী। ওর হাতে জাদু আছে।

কথাপ্রসঙ্গে অধীর হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসে—অম্বির লেখা কবিতা কোথায়? দেখতে চাই, কার রচনা ভাল।

রমা বিব্রতভাবে বলে—অম্বি ওসব···।

অধীর নিজের কথার ঝোঁকেই নানা প্রশ্ন করতে থাকে।—অম্বিও কি ইংলিসে অনার্স নিয়েছে। অম্বির এখন কোন্ ইয়ার?

কোন কবিকে ভাল লাগে অম্বির ? সেক্সপীয়রের ব্ল্যাঙ্ক ভার্স ভাল, না মিল্টনের ব্ল্যাঙ্ক ভার্স ভাল ?

রমাই অপ্রস্তুত হয়ে, আর একটু বিচলিত হয়ে বাধা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে অধীরকে—অম্বিকে কেন মিছিমিছি ওসব কথা ব'লে··· ।

হঠাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন উপেন, চারুবালা আর পিসিমা। উপেন আর চারুবালা পিসিমাকে নতুন বাড়ির অন্দর ও বাহিরের মূর্তিটাকে দেখিয়ে ঘোরাফেরা করছিলেন। কোথায় এখনো কাজ বাকি আছে, কোথায় নতুন দুটো ঘর আরও হবে। একটা অসম্পূর্ণ সিঁড়ির কাছে এসে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন পিসিমা। আতঙ্কিত পিসিমা বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বলেন—এ যে আত্মহত্যার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছ উপেন।

তারপর আবার নারকেলের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পারিবারিক নানা সমস্যা ও কথা আলোচিত হয়। অম্বির জন্য যে দুশ্চিন্তা রয়েছে মনে, সে-কথাও প্রকাশ করেন চারুবালা। অম্বির সম্বন্ধে মন্তব্য করেন—মেয়েটা অবুঝ নয়, এবং ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়াও হয়েছে। সাধারণ, যে-কোন জাতের ঘর, একটু গরীব হলেই বা ক্ষতি কি, মোটামুটি মানুষ ভাল, এইরকম ঘরে যদি মেয়েটাকে নিতে কেউ রাজী হতো তবে··· ।

পিসিমা আশ্বাস দেন—বল তো আমি চেষ্টা করি।

চেষ্টা করুন পিসিমা।

পিসিমারও মনের ইচ্ছা, অম্বির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা আগে ভাগেই করে রাখা ভাল। কারণ পিসিমার মনে একটা শঙ্কা আছে যে, উপেনের এই সম্পত্তির অধিকারে যেন অম্বি নামে ঐ পরের মেয়েটা কোন ভাগ দাবি করার সুযোগ না পায়। যেন ঐ ঝঞ্ঝাটই না দেখা দেয়, তারই জন্য পিসিমার মনে চিন্তা আছে। একমাত্র মেয়ে রমাই পাবে সম্পত্তি, এবং রমার পাওয়া অর্থ তাঁর

নাতি অধীরের পাওয়া। অম্বির যদি বিয়ে না হয়, তাহলেও নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। কারণ মায়ার বশে উপেন তার ঐ পালিতা মেয়ের জন্য সম্পত্তির কিছু রেখে যাবেই। সমস্যার এই দিকটা কদিন থেকেই পিসিমার মনের ভিতরে একটা দুশ্চিন্তা জাগিয়ে তুলছে।

অম্বির সম্বন্ধে উপেন আর চারুবালার মায়ার ব্যাপার দেখে মনে মনে আরও সাবধান হয়েছেন পিসিমা। হ্যাঁ, খোঁজ করতে হবে, উপেনের এই পালিতা মেয়েটার জন্য এমন একটি পাত্র খুঁজতে হবে, যাকে মাত্র দু-তিনটি হাজার টাকা হাতে ধরিয়ে দিলেই সে খুশী হয়ে উপেনকে দায়মুক্ত করে দেবে। তারপর, উপেনের যা রইল, সবই মেয়ে রমার জন্য, অর্থাৎ জামাই-এর জন্য; অর্থাৎ তাঁরই স্নেহের নাতি অধীরের জন্য রইল। এই ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে পারলেই খুশী মনে কেদার-বদরী যেতে পারবেন পিসিমা।

পিসিমা তাঁর যুক্তিগুলি মনের ভিতর চেপে রেখে শুধু ইচ্ছাটাকেই ব্যক্ত করলেন। আশ্বাস দিলেন—কোন চিন্তা নেই, অম্বির একটা না একটা গতি ক'রে দিচ্ছি।

হঠাৎ চোখে পড়ে সকলেরই, চন্দ্রমল্লিকার সারির কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করছে অধীর আর রমা, আর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে শুনছে অম্বি। দৃশ্যটাকে দেখতে ভাল লাগে না কারও। তাই সবাই ব্যস্তভাবে ঘটনাকে যেন একটু ভাল ক'রে বুঝবার জন্য এগিয়ে এসে এখানে দাঁড়িয়েছেন।

অধীর রমার কলেজ ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বলে—রমার কবিতা চমৎকার। আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম, অম্বি কেমন লেখে?

চারুবালা মৃদু হেসে বলেন—তুমি ভুল বুঝেছ অধীর। অম্বির ওসব গুণ নেই। অম্বি এইসব ফুল ফোটানো আর বাগান সাজানোর কাজই করতে পারে, আর এইসব কাজ নিয়েই আছে।

অধীর হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। পিসিমাই বাধা দিয়ে বলেন—চল্ দাদু।

অন্বি একা দাঁড়িয়ে থাকে চুপ ক'রে। আর উপেন চারুবালা পিসিমা রমা ও অধীর ফটক পর্যন্ত এগিয়ে যায়। বিদায় নেয় পিসিমা ও অধীর।

এত বড় পৃথিবীর সংসারভরা এই আলোছায়ার মধ্যে যেন বিশেষ ক'রে তিনটি স্থানের ঘটনার রূপগুলিই একে একে বদলে যেতে থাকে। ব্যারাকপুরের এই নতুন বাড়ি, শ্যামবাজারের ঐ বনেদি বাড়ি, আর বেলভেডিয়ার বাগানের ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পাঠকক্ষ। এই তিন ভিন্ন স্থানের মানুষগুলির মনের আগ্রহও এক একটি কারণে ও ঘটনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

পিসিমা ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন, দুটি চেষ্টায়। অধীরকে বিয়ে করতে রাজী করাবার চেষ্টায়। পিসিমার বিশ্বাস আছে, অধীরের বিয়ে করতে রাজী হওয়ার অর্থ রমাকে বিয়ে করা। উপেনের সম্পত্তির বংশের ও স্বভাবের গুণগান করেন পিসিমা। রমার প্রশংসায় সর্বদা মুখর হয়ে থাকেন পিসিমা। অধীর শোনে, বেশ আগ্রহ নিয়েই শোনে। কিন্তু স্পষ্ট ক'রে কোন মন্তব্য করে না।

আর একটি দুরূহ ব্রতে ব্রতিনী হয়েছেন পিসিমা। অন্বির জন্য একটা পাত্রের সন্ধান। বটার মাকে বলেন, ড্রাইভারকে বলেন, বলতে বলতে মনের কথাও প্রকাশ ক'রে ফেলেন পিসিমা—তোমরা চেষ্টা ক'রে একটা খোঁজ খবর কর, যেমন-তেমন একটা মানুষ হলেই হোলো। দোজবরে হোক, আর তেজবরে হোক। যে-কোন জাত হোক। হাভাতে হোক, আর যা-ই হোক, কুড়িয়ে পাওয়া একটা মেয়েকে পার করতে হবে, তার জন্য তো আর রাজপুত্তুর পাওয়া যাবে না।

ড্রাইভার আশ্বাস দেয়, বটার মা'ও বলে—দেখছি খুঁজে, নিশ্চয় পাওয়া যাবে এমন পাত্তর।

ন্যাশনাল লাইব্রেরির পাঠকক্ষে একা বসে যখন বই-এর স্তূপ ঘাঁটাঘাঁটি করে অধীর, তখন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকে। হঠাৎ নিজেই লজ্জা পায়।

পর্দা সরিয়ে পৌঢ় স্কলার ডক্টর ব্যানার্জি যখন উঁকি দেন, তখন আনমনা ও উদাস অধীরকে দেখে বেশ একটু বিস্মিত হন। হেসে হেসে প্রশ্ন করেন—হ্যালো ইয়ং স্কলার, আনমনা কেন?

লজ্জিত অধীর ডক্টর ব্যানার্জিকে কাছে ডেকে আবার তার থিসিস নিয়ে আলোচনা করে। ডক্টর ব্যানার্জি আশ্চর্য হয়ে বলেন —সে কি, আর কিছুই তো এগোয়নি দেখছি, সেই হেরিডিটির চ্যাপ্টার নিয়েই পড়ে আছে।

স্কলার বন্ধুরা মাঝে মাঝে লাইব্রেরির বারান্দার আড্ডায় আলোচনা করতে বিস্ময় প্রকাশ করতে গিয়ে সন্দেহই করে ফেলে—অধীরের হলো কি? আজকাল প্রায়ই অ্যাবসেণ্ট হচ্ছে দেখছি। যায় কোথায়?

বন্ধুরা জানেন না, অধীর তখন ব্যারাকপুরের এক নতুন বাড়ির বাতাসে যেন তার জীবনের প্রথম অনুভূত এক সৌরভের রহস্যকে সন্ধান ক'রে ফিরছে। প্রায়ই আসে অধীর। এবং অধীরের এই আসা-যাওয়ার ঘটনার ভিতর দিয়েই এই বাড়ির যে পরিণাম তৈরী হয়ে চলেছে, সেটা এই বাড়ির বাপ ও মা অনুমান করতে পারেন।

অধীর বুঝতে পেরেছে, কেন সে আসে? কোন গুণ নেই, কবিতা লিখতে পারে না, সামান্য লিখতে পড়তে মাত্র শিখেছে, অম্বি নামে সেই মেয়েই যে মূর্তিমতী কবিতার মত ফুটে রয়েছে। এই বাড়ির বাগানের চন্দ্রমল্লিকাও যেন অম্বির মতই গম্ভীর অথচ স্নিগ্ধ। শুধু চোখের তৃষ্ণা নয় বুঝতে পেরেছে অধীর, তার মনের

এক দুর্বার তৃষ্ণা তাকে একেবারে বেহায়া ক'রে দিয়ে এই বাড়ির দিকে টেনে আনে, প্রায় প্রতিদিন। অম্বিকে দেখতে ভাল লাগে, অম্বিকে দেখতে আশ্চর্য লাগে।

আর, উপেন ও চারুবালা বুঝতে পেরেছেন, তাঁদের সুন্দরী শিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না মেয়ে রমার রূপের আর গুণের আকর্ষণেই অধীর নামে ঐ শিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন আর উচ্চবংশীয় ছেলেটি এখানে আসে। দেখতে পায়, দেখে নিঃসংশয় হন উপেন আর চারুবালা। রমার প্রতিভা, রমার লেখা-পড়ার কৃতিত্ব, রমার নানা গুণের প্রশংসা করে অধীর। অম্বির সঙ্গেও মাঝে মাঝে কথা বলে অধীর, কিন্তু সেটা নিতান্তই কথা বলা মাত্র। দেখে খুশী হয়েছেন চারুবালা, অম্বিও অধীরের কাছ থেকে দূরে থাকতে ভালবাসে। বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে অম্বিকে, ভাল করেই জানে অম্বি, অম্বির ছোঁয়া জল খেলে জাত যাবে অধীরের। সুতরাং অন্য কোন ভয়কে মনে স্থান দেন না চারুবালা ও উপেন।

এর মধ্যে চিন্তার দিক থেকে শুধু নির্বিকার মনে হয় রমাকে। রমা এখনো যেন রহস্যের বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারে নি। আড়ালে আলাপ ক'রে হাসাহাসি করেন উপেন ও চারুবালা।—রমা মেয়েটার মনটা একেবারে সাদা। এখনো কল্পনাও করতে পারে নি যে, অধীর ওকে বিয়ে করতে চায়, ওরই জন্য অধীর আসে, বিয়ে হবে অধীরেরই সঙ্গে। যদি বুঝতো, তবে রমা সেদিন অমন করে অধীরকে একা ঘরে বসিয়ে রেখে গটগট ক'রে কলেজের স্পোর্টসে চলে যেতে পারতো না। এখনো স্পোর্টসই ওর কাছে জীবনের সব চেয়ে বেশী প্রিয়।

চারুবালা মাঝে মাঝে উপদেশ দেন রমাকে—অধীর এলে ওরকম হেলাফেলা ভাব দেখাস নি। কত ভাল ছেলে, কত শিক্ষিত, কত বড় বংশের ছেলে। আপন জন মনে করে বলেই তো আসে।

কিন্তু এই উপদেশ প্রায়ই ভুলে যায় রমা।

বারান্দার থামের পাশে সোফায় বসে আপ্পির চাদরের ছেঁড়া রিপু করে অম্বি। হঠাৎ ফটকের দিকে চোখ পড়তেই চমকে ওঠে। অধীর আসছে, থামের আড়ালে লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করে অম্বি। কিন্তু অধীর এসেই হাসিমুখে অম্বির কাছে দাঁড়ায়। অম্বি অপ্রস্তুত ভাবে আর একটা ঘর দেখিয়ে দিয়ে বলে—আসুন, রমা আছে ওখানে।

অধীরও একটু বিব্রতভাবে চলে যায় রমার ঘরের দিকে। রমাও অধীরকে দেখতে পেয়েই ব্যস্তভাবে বলে—আসুন! পর-মুহূর্তে বলে—ঐ যে ওখানে অম্বি বসে রয়েছে।

অধীর বলে—হ্যাঁ, অম্বির সঙ্গে দেখা হয়েছে।

দুচারটে মোটা মোটা বই আর ম্যাগাজিন অধীরের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে রমা বলে—পড়ুন, আমি আসছি।

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে অম্বিকে দেখে একবার থমকে দাঁড়ায় রমা। তারপর বলে—গীতার মা ডেকেছে, আমি চললাম অম্বি।

অম্বি—কেন ?

রমা—চণ্ডালিকার রিহার্সাল আছে।

তারপর একটু ভ্রূভঙ্গি ক'রে আর বাইরের ঘরের দিকে ইঙ্গিত ক'রে আস্তে আস্তে বলে—আর পারিনা, ভদ্রলোক সব সময় বই নিয়ে যত ঘ্যানর ঘ্যানর…ধেৎ।

অম্বি শাসনের ভঙ্গিতে বলে—ছিঃ, কি আবোল-তাবোল বলছিস!

চলে যায় রমা।

চারুবালা এসে বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করেন অম্বিকে—রমা কোথায় গেল ?

অম্বি উত্তর দেয়—গীতাদের বাড়ি।

চারুবালা মেয়ের উদ্দেশ্যে ধমক দিতে গিয়ে সামলে নিলেন। তারপর ঘরের ভিতরে অধীরের কাছে এসে রমারই প্রশংসা ক'রে বলেন—রমা খুব সুন্দর আবৃত্তি করতে পারে কি না, তাই ওরই ওপর অভিনয় দেখাবার ভার পড়েছে। গুণ আছে, লোকে ছাড়বে কেন? যাক···তুমি চা না খেয়ে যেও না অধীর।

চারুবালা চলে যেতেই এই বাড়ির এইখানে যে একটি নিভৃত এক মধুর সুযোগ নিয়ে আপনি ধরা দেয়, সেই নিভৃতের মধুরতা তুচ্ছ ক'রে থাকতে পারে না অধীর। পড়ার ঘর থেকে নিজেই উঠে আসে বই হাতে নিয়ে। অম্বির কাছে এসে দাঁড়ায়। অম্বি অপ্রস্তুতভাবে উঠে দাঁড়ায়। অধীর বলে—তোমার সব চেয়ে বড় গুণ কি জান অম্বি?

অম্বি আশ্চর্য হয়—আমার?

অধীর—হ্যাঁ তোমার সব চেয়ে বড় গুণ হলো, তোমার কোন গুণ নেই।

অধীরের কথার মধ্যে যেন মোহ আছে। কিন্তু শুধু শুনতে পেয়ে নয়, অধীরের চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে সন্ত্রস্ত হয় অম্বির চোখের দৃষ্টি। অধীরের ঐ চোখেও যে কেমন একটা মুগ্ধতা ফুটে রয়েছে।

অম্বি প্রশ্ন করে—দিদিমা কেমন আছেন?

হেসে হেসে অনুযোগ করে অধীর—এই কি আমার কথার উত্তর হলো?

অম্বি হাসে—আমি কি বলবো বলুন?

অধীর—কেন? জিজ্ঞাসা করলেই তো পার, আমার সব চেয়ে বড় দোষ কি?

অম্বি—আপনার দোষ?

অধীর—হ্যাঁ।

অম্বি হাসে—আপনার দোষ থাকলেও আমি তো কিছু জানি না, বুঝতেও পারি না।

অধীর—সত্যিই বুঝতে পার না ?

অম্বি—না।

অধীর—আমার সব চেয়ে বড় দোষ, তোমাকেই দেখবার জন্য এখানে আসি।

চমকে ওঠে ; ভীতভাবে মুখ লুকোবার চেষ্টা করে অম্বি। ঘরের ভিতর থেকে ডাক শোনা যায় চারুবালার—তোমায় চা দেওয়া হয়েছে অধীর।

একেই বোধ হয় বলে পরশমণির ছোঁয়া। অম্বির মনের সব ভাবনা ও স্বপ্নের রং বদলে দিয়ে গেল অধীরের ঐ কয়েকটি কথা আর অধীরের চোখের ঐ দৃষ্টি।

কাজ করতে করতে আনমনা হয় অম্বি। জীবনে এই প্রথম হঠাৎ ভুল ক'রে কাজের মাঝখানেই বারান্দার উপর এসে দাঁড়ায়। দৃষ্টি ছুটে যায় ফটকের দিকে। আগন্তুক একটা পদধ্বনির জন্য অম্বির মনের কল্পনাই যেন উৎকীর্ণ হয়ে থাকে। কখনো বা এসে রমার পড়ার ঘরের ভিতরে দরজার বাইরে থেকে উঁকি দেয়। দেখতে পায়, শুধু একা রমা পড়ার বই কোলে নিয়ে কৌচে বসে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ চোখ মেলে তাকায় রমা। প্রশ্ন করে—কি রে ? চোরের মত তাকাচ্ছিস কেন রে ?

ঘরে প্রবেশ করে অম্বি।—তুই ডাকাতের মত ঘুমোচ্ছিস কেন রে ? পরীক্ষা এগিয়ে আসছে মনে নেই।

—তুইও আমাকে শাসন করবি ? রমা তেড়ে আসে। অম্বি ছুটে গিয়ে হলঘর পার হয়ে একেবারে ভিতরের বারান্দায় গিয়ে আম্মির পিছনে ভালমানুষের মত দাঁড়ায়। রমা ব্যর্থ হয়ে

ভালমানুষের মত বই হাতে চারুবালার চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে।

কৌতূহলী হয়ে রমাকে প্রশ্ন করেন উপেন—কি, কি, কিছু বুঝতে হবে নাকি? হিস্ট্রি?

রমা বই-এর আড়ালে মুখ টিপে হাসে—না।

উপেন বাইরে বের হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। চারুবালা বলেন—ব্যাঙ্কের কাজ সেরে, জিনিসপত্রগুলি একেবারে কিনে নিয়েই চলে এস।

কতগুলি পায়ের শব্দের সাড়া এগিয়ে আসে। প্রবেশ করেন পিসিমা আর অধীর।

উপেন বলেন—আসুন পিসিমা, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেবেন, এখনি একবার কাজে বের হতে হচ্ছে।

অম্বি বলে—এই রোদের মধ্যে এখন আবার কোথায় চললে আপ্পি?

উপেন—রোদে পুড়ে আর জলে ভিজে পাহাড়ে জঙ্গলে কাজ করেছি ত্রিশটি বছর। রোদের ভয় আমাকে দেখাস না অম্বি!

কিন্তু উপেনকে সহজে রেহাই দেয় না অম্বি। দেখতে পায় অম্বি, আপ্পির কামিজের একটা বোতাম নেই। ছুঁচ সুতো আর বোতাম নিয়ে আসে অম্বি। জামাতে বোতাম বসিয়ে ছুঁচ চালাতে থাকে। তার পরও থামে না। উপেনকে চেয়ারে বসিয়ে, জুতোর ফিতে আবার ঠিক ক'রে বেঁধে দেয়। ব্রাশ নিয়ে আসে, উপেনের মাথার চুল অম্বি নিজের হাতেই ব্রাশ ক'রে দেয় ভাল ক'রে।

উপেন স্নেহার্দ্র স্বরে বলেন,—অম্বির অত্যাচার এইভাবেই সহ্য করছি পিসিমা। এই মেয়েটা আমাকে একটা খোকা ক'রে রেখেছে।

পিসিমা শুকনো স্বরে বলেন—তুমি বেরুচ্ছ উপেন, কিন্তু আমার যে একটা দরকারী সংসারী কথা ছিল···।

—হ্যাঁ বলুন। ইঙ্গিতে পিসিমাকে অন্য ঘরে আসতে আহ্বান জানিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন উপেন আর চারুবালা। চারুবালা বলে যান—অধীরকে চা দিতে ভুলিস না রমা।

কিন্তু ভুল হয় রমার। হঠাৎ রমাও পাশের বাড়ির এক জানালার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে—দরকারী কথা ?

সত্যিই পাশের বাড়ির জানালায় এক মহিলার মূর্তি হাত তুলে ইঙ্গিতে রমাকে ডাকছিলেন। অম্বির দিকে তাকিয়ে রমা বলে—হাসিবৌদি ডাকছেন, কি যেন বলতে চাইছেন।

চলে যায় রমা। ভিতরের বারান্দায় আবার এক নিভৃত অধীর ও অম্বির সান্নিধ্যকে যেন নিবিড় ক'রে দেবার জন্য আপনি রচিত হয়।

অম্বি চোখ তুলে তাকাতে পারে না তারই মুখের দিকে, যাকে দেখবার জন্য ওর সারাক্ষণের আগ্রহ উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

অধীর বলে—রমা ঠিকই বলেছিল অম্বি। তোমার হাতে জাদু আছে।

অম্বি লজ্জিত হয়।—ওরকম ক'রে বলবেন না।

অধীর—স্বচক্ষেই তো দেখলাম, তোমার হাতের ছোঁয়া পেয়ে উপেনবাবু কেমন শিশুর মত হয়ে গেলেন।

ওদিকের পাশের বাড়ির জানালায় হাসিবৌদি আর রমার মধ্যে আলোচনা চলে। হাসিবৌদির কথাগুলির আড়ালে কেমন একটা ঠাট্টা যেন লুকিয়ে। প্রশ্ন করেন হাসিবৌদি—কে উনি ?

রমা বলে—আত্মীয়।

হাসিবৌদি—কেমন আত্মীয় ?

রমা—বাবার মাসতুতো ভাই-এর পিসিমার নাতি, শ্যামবাজারে থাকেন।

হাসিবৌদি নাক কুঁচকে হাসেন—অ্যাঁ, তাই বলো, অনেক দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

রমা—হ্যাঁ।

হাসিবৌদি—তাহলে নিকট সম্পর্ক হয়ে যেতে কোন অসুবিধা নেই ?

রমা—আজ্ঞে ? কি বললেন ?

হাসিবৌদি হাসতে হাসতে জানালা থেকে সরে যান— আচ্ছা আসি।

রমার হঠাৎ মনে পড়ে চায়ের কথা। নিজের মনেই আক্ষেপ করে—দূব ছাই, ভুলেই গিয়েছি। চা, চা তৈরী কর ঠাকুর। বলতে বলতে অন্যদিকে চলে যায় রমা।

অন্য ঘরে পিসিমা সেই দরকারী সংসারী কথাটা ব্যক্ত করেন। —অম্বির জন্য পাত্রের সন্ধান পেয়েছি। তলাপাত্র, বেশ ভাল পাত্র। তোমরা আর মনে কোন বাধা না রেখে রাজী হয়ে যাও উপেন।

পাত্রের পরিচয়ও জানিয়েছেন পিসিমা—পাত্রের একটু বয়স হয়েছে, এই যা। আর জাতের দিক দিয়ে একটু নীচু, এই মাত্র। কিন্তু টাকা পয়সা বেশ আছে। আর সংসারে একেবারে একা মানুষ, আপন বলতে কেউ নেই। সামান্য রকমের যৌতুক দিলেই…।

চারুবালার মুখটা হঠাৎ বিষণ্ণ হয়, চোখও হঠাৎ কেঁপে ওঠে। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেন—পাত্রের বয়স কি খুবই বেশি ?

পিসিমা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন—হ্যাঁ গো, বেশি বৈকি, এই আমাদের অধীরের বয়সেরই মত একটু বেশি বয়স।

চারুবালা হাঁপ ছাড়েন—তাহলে আব কি এমন বয়স ? বেশ কাঁচা বয়স, অম্বির সঙ্গে মানাবে ভাল।

পিসিমা বলেন—সহজে কি রাজী হয় ? শুধু আমার উপদেশে রাজী হয়েছে, আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে কিনা।

উপেন বলেন—আপনি যখন বলছেন ভাল, তখন আমাদের মনে আর কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না পিসিমা।

পিসিমা আবার সেই সামাজিক ভয়ের কথা তুলে সূক্ষ্ম কৌশলে যেন আর একবার উপেনকে একটু ভয় পাইয়ে দেন। পিসিমা বলেন—অম্বিকে বিদায় না করার আগে আমিই বা কোন্ প্রাণে রমাকে বিয়ে করবার জন্য অধীরকে বলতে পারি। তোমরা জাতের নিয়ম না মেনে যে বংশের সম্মান একটু গোলমাল ক'রে রেখেছো।

চুপ ক'রে শুনতে থাকেন উপেন ও চারুবালা।

পিসিমা বলেন—তবু তুমি কি যেন ভাবছো উপেন।

উপেন—মেয়েটার কথাই ভাবছি পিসিমা। নিজের মেয়ে নয়, কিন্তু তবু ঐ মেয়েটাই চলে গেলে আমার কি দশা হবে বুঝতেই পারছেন, স্বচক্ষেই তো দেখলেন। আমি কিসে পয়সা খরচ করলাম, আমি মনে করতে পারি না। মনে করিয়ে দেয় অম্বি। আমার হাতের লাঠিটা হাতের কাছে অম্বি এগিয়ে না দিলে, লাঠি নিতেই ভুলে যাই।

চারুবালা বলেন—কথাটা সত্যিই, অম্বি চলে গেলে সব চেয়ে বেশি কষ্টে পড়তে হবে ওঁকেই।

পিসিমা মনের বিরক্তি চেপে রেখে বলেন—তাতো হবেই। কাজের ঝি-চাকর চলে গেলে কষ্টে পড়তে হয়। ওরকম কষ্ট সবাইকে সহ্য করতে হয়। আমার কাছেও তো ছিল সাবিত্রী, এগারটি বছর। হঠাৎ চলে গেল, আমাকেও কষ্টে পড়তে হয়েছিল বৈকি।

চমকে ওঠেন উপেন আর চারুবালা। কাজের ঝি-চাকর চলে গেলে যতটুকু কষ্ট হয়, মাত্র ততটুকু কষ্ট হবে অম্বি চলে গেলে? তাই কি? এই ভয়ংকর মিথ্যাটাই কি সত্য? উপেনের শান্ত চোখ দুটো হঠাৎ বড় বেশি ছটফট করতে থাকে। চারুবালা কেঁপে কেঁপে নিঃশ্বাস ছাড়েন।

উপেন কুণ্ঠিতভাবে বলেন—না, কথাটা ঠিক তা নয়। যাক গয়ে···পাত্র যদি ভাল হয়।

পিসিমা—যদি বলছো কেন, সব দিক দিয়ে ভাল পাত্র।

চারুবালা—বেশ তো, কথা রইল, আমরাও একবার পাত্রকে দেখি…তারপর।

পিসিমা—নিশ্চয়, দেখবে বৈকি।

ভিতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অধীর তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে অশ্বিকে কি-যেন বলবার জন্য চেষ্টা করছিল; আর অশ্বির চোখ দুটোও যেন ভয় পেয়ে অধীরের মুখের দিকে অপলক হয়ে তাকিয়ে ছিল।

অধীর বলে—তোমার সঙ্গে আমারও যে একটা দরকারী সংসারী কথা আছে অশ্বি।

অশ্বি বলে—বলুন।

ডাক শোনা যায়—অধীর কোথায় রে।

পিসিমা ডাকছেন। এই দিকেই আসছেন পিসিমা, উপেন আর চারুবালা। আর কথা বলা হলো না। চলে গেল অধীর।

অন্য ঘরের নিভৃতে জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে অশ্বি সেই মানুষের মূর্তিটাকে, যে-মানুষ আজ না বলা কথার বেদনা নিয়ে চলে গেল।

রমার জন্মদিনের উৎসবটাই একটা ঘটনা সৃষ্টি ক'রে অধীর ও অশ্বির মনকে আরও নিবিড় সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়ে মধুর পরিণামের চিহ্ন অঙ্কিত ক'রে দিল।

সে ঘটনায় বেদনার অশ্রু ছিল, কিন্তু সেই অশ্রুর মধ্যেও ক্ষণিকের এক হর্ষময় মধুরতা হঠাৎ দেখা দিয়ে আবার যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেল।

রমার জন্মদিন। প্রতি বছর রমার জন্মদিন হয়ে আসছে। আর শুধু আপ্পি আর আম্মির কাছে গল্প শুনেছে অশ্বি, ছোট্ট অশ্বি একদিন

রমাকে হিংসে ক'রে আর জোর ক'রে জন্মদিন করিয়ে নিয়েছিল। সেই কাহিনীটুকুই জানে অম্বি, সেই ঘটনার ছবি একটুও মনে পড়ে না। অম্বি জানে, তার জন্মদিনটাই হারিয়ে গিয়েছে এই পৃথিবীর বাতাসে চিরকালের মত।

রমার জন্মদিন। পরিপাটি সাজে সেজেছে রমা। অম্বির ঘরের ভিতর হঠাৎ এসে ধমক দেয় রমা—কি, আজও তুই পেত্নী সেজে থাকবি না কি? তা হবে না।

অম্বিকে প্রায় জোর ক'রে সাজাতে থাকে রমা। সাজ শেষ হলে হাত ধরে বাইরের ঘরে টেনে নিয়ে যেতে থাকে, যেখানে অভ্যাগতদের জন্য আসর সাজানো হয়েছে।

অম্বির মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে, এবং তারপরেই স্নেহাক্ত ও মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন চারুবালা ও উপেন। রমার সঙ্গে ড্রয়িংরুমের দিকে চলে যাচ্ছে অম্বি। উপেন আর চারুবালা চাপাস্বরে, যেন একটা বেদনা চাপা দিয়ে আলাপ করেন—অম্বিটার মুখটা কি সুন্দর দেখতে তো। কপালের শুধু একটা চন্দনের টিপেই সারা মুখটা মিষ্টি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভাগ্যের দোষ··।

উপেন—আমাদেরই ভাগ্যের দোষ বল।

চারুবালা—তা তো বটেই।

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সব চেয়ে আগে এলেন পিসিমা, সঙ্গে অধীর। এসেই রমার গলায় পড়িয়ে দিলেন একটি হার—জন্মদিনের উপহার।

উপেন আর চারুবালা একসঙ্গে বলেন—এ আবার কি কাণ্ড করলেন পিসিমা। আপনার আশীর্বাদই যে যথেষ্ট।

পিসিমা—এতদিন তোমরা দূরদেশে ছিলে, চোখেও দেখতে পাই নি মেয়েটাকে, আর মনের সাধও পূর্ণ করতে পারি নি। আজ সুযোগ পেয়েছি, ছাড়বো কেন?

ড্রইং-রুমে সোফার উপর একা বসে ছিল অম্বি। হাতে একটি

ছবির এলবাম। রমার জীবনের উনিশটি জন্মদিনের তোলা ফটো। শেষ দিক থেকে এলবামের পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় এসে থামে অম্বি। ফটোতে চারুবালা ও উপেন পাশাপাশি বসে আছেন, তাঁদের মাঝখানে তিন বছর বয়সের রমা। কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে, তারপর আবার পাতা উলটে একেবারে প্রথম পাতায় এসে থামে অম্বি। চারুবালার বুকের উপর রয়েছে এক বছর বয়সের রমা। এক শিশুর প্রাণ তার মায়ের স্নেহের তপ্ত নীড়ের মধ্যে শুয়ে আছে। সে-ছবি দেখতে দেখতে ছলছল করে অম্বির চোখ। পিছন থেকে এগিয়ে এসে অম্বির কাছে দাঁড়ায় অধীর। কে জানে কখন এসে এবং কতক্ষণ ধরে চুপটি ক'রে অম্বির সোফার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল অধীর।

অম্বি চমকে ওঠে—আপনি কখন এলেন ?

অধীর—অনেকক্ষণ। কি দেখছিলে তুমি ?

—রমার জন্মদিনের ছবি।

—কোন্ ছবিটা সবচেয়ে ভাল ?

—সবগুলিই ভাল।

—না, আমি বলবো ?

—বলুন।

অধীর দেখায় দুটি ছবি—এটা আর এটা, কেমন ? সত্যি নয় ?

—হ্যাঁ, সত্যি। এলবামের মধ্যে সব চেয়ে ভাল হলো ঐ দুটি ছবি, একটি আম্মির কোলে একবছর বয়সের রমা, আর একটি আপ্পি ও আম্মির মাঝখানে তিন বছর বয়সের রমা।

অম্বি তখনো ধারনা করতে পারে নি, কদিনের পরিচিত এই সম্পূর্ণ অনাত্মীয় ভিন-জগতের একটি মানুষ অম্বির মনের গভীর গোপন করা জীবনের সব চেয়ে বড় অভাবের বেদনাময় রূপটি ধরে ফেলতে পেরেছে। কিন্তু বুঝতে হলো আর কিছুক্ষণ পরে।

রমা এসে অধীর আর অম্বিকে ডেকে নিয়ে গেল। আক্ষেপ করে রমা—যা সব চেয়ে খারাপ লাগে আমার, তাই এখন করতে হবে।

অধীর—কি?

রমা—গান।

আসরে গিয়ে চারুবালা ও উপেনের কাছে দাঁড়ায় দুজনে, অম্বি ও রমা পাশাপাশি দুটি শান্ত স্নিগ্ধ ও সুন্দর মেয়ে। সেই ভুল করলো অভ্যাগতেরা, এবং সেই ভুল করলেন চারুবালা ও উপেন, অম্বিও।

আগন্তুক মহিলা ও ভদ্রলোকেরা, সবাই নিকট বা দূর সম্পর্কের আত্মীয় অথবা পরিবারের বন্ধুস্থানীয়, প্রত্যেকেই অম্বিকে দেখিয়েই প্রথম প্রশ্ন করেন, এইটি বুঝি আপনার আপন মেয়ে আর ঐটি পালিতা। বেঁচে থাক, সুখে থাক।

চারুবালা বলেন—না, এটি আমার মেয়ে রমা, ঐটি হলো এখন আমার মেয়েরই মত।

অম্বির স্নিগ্ধ মুখে বেদনার ছায়া পড়ে। চারুবালাও তারপর যেন আক্রোশের সঙ্গে প্রত্যেকেরই ঐ অদ্ভুত ভুল ধারণার উপর রাগ করে আরও জোরে বলতে থাকেন—এটি হলো আমার মেয়ে। ওটি হলো মেয়ের মত।

মেয়ের মত! মেয়ের মত! শুনতে শুনতে আর সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না অম্বি। চারুবালারও অভিমান ও অহংকারের কোথায় যেন ঘা পড়েছে। অম্বির সুন্দর সাজ আর মুখের ছলনায় তাঁর নিজের মেয়েরই পরিচয় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। অম্বির দিকে অপ্রসন্নভাবে তাকান চারুবালা, যেন অম্বি এখানে না থাকলেই ভাল ছিল।

চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল অম্বি। আসরের এক প্রান্তে সোফার উপর বসে অধীর দেখতে পায় সেই দৃশ্য। চমকে ওঠে অধীরের চোখের কৌতূহল।

রমার কলেজ-বান্ধবীরা একটা গান রচনা ক'রে উপহার দিয়েছে রমাকে। রমাকে এখনি গাইতে হবে সেই গান। পীড়াপীড়ি করেন গুরুজনেরা। বান্ধবীরাও সমর্থন করে। শেষে গাইতে হয়। সুন্দর গলায় সুন্দর সুরে গান গায় রমা। বান্ধবীরাও সুরে সুর মিলিয়ে গানের মধুরতা আরও মধুর ক'রে তোলে।

কিন্তু এই গানের জগৎ থেকে নীরবে সরে পড়েছে অধীর। এখানে একজনের জন্মদিনের মাঙ্গল্য কলরব ও আনন্দ সুরময় হয়ে উঠেছে, কিন্তু আর একজন কোথায় গেল, যার জন্মদিনের পরিচয় অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ফেলেছে ?

চন্দ্রমল্লিকার সারির কাছে একটি ছায়া ঘুরে বেড়ায়, দেখতে পায় অধীর। অম্বির কাছে এসে দাঁড়াতেই নীরব ও আনমনা অম্বি চমকে ওঠে—কে ?

—আমি ?

—আপনি কেন উঠে এলেন ?

—তুমি কেন উঠে এলে ?

—আপনি বুঝবেন না।

—আমি বুঝেছি।

—পৃথিবীতে কারও বোঝবার সাধ্যি নেই।

—আমার সাধ্যি আছে।

—বলুন তো, কেন ?

অধীর সমবেদনার সুরে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—ওটা তো একটা কথার কথা মাত্র, তার জন্য এত দুঃখ পাও কেন ?

চোখ বড় ক'রে বিস্মিত হয়ে অম্বি প্রশ্ন করে—কি কথা ?

অধীর—আম্মির আর আপ্পির মুখের ঐ কথা, মেয়ের মত।

দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে অম্বি। জীবনে এই প্রথম

একজনের চক্ষু ধরে ফেলেছে তার জীবনের সব চেয়ে গোপন রহস্যকে।

অধীর বলে—তুমি তো উপেনবাবুর মেয়ে, কার সাধ্যি আছে পৃথিবীতে অস্বীকার করবে এই সত্য?

—আপনি স্বীকার করেন?

—নিশ্চয়ই।

অম্বি—বলুন, আর একবার বলুন, আমারই তাহ'লে ভুল হয়েছে। বলুন, ওটা একটা কথার কথা মাত্র।

অধীর—বলছি, তোমার অভিমানের ভুল। ওটা তোমার আপ্তি ও আম্মির কথার ভুল। পৃথিবীর চোখের কাছে তুমি যে উপেনবাবুরই মেয়ে।

আসর থেকে জন্মদিনের মহিমার সঙ্গীত রেশ ছড়ায়, সেই রেশ ভেসে আসে। অধীর প্রশ্ন করে—তোমার জন্মদিন কবে অম্বি?

অম্বি—হারিয়ে গিয়েছে, অন্ধকারে।

অধীর—বুঝলাম না।

অম্বি—এত বুঝতে পারছেন, এটা বুঝতে পারছেন না কেন? আমার জন্মদিনের খবর কেউ জানে না।

অধীর—আমি যদি বলি, কেউ একজন জানে।

—কে?

—ঐ আকাশ। এই রকমই সেদিন আকাশে তারা ছড়িয়ে ছিল।

অম্বি হাসে—সত্যি কথা?

অধীব—বিশ্বাস করবে কি, যদি বলি, আজ তোমার জন্মদিনকেই ভালবেসে উপহার দিতে ইচ্ছে করছে আমার।

অম্বি—বিশ্বাস করবো।

অম্বির একটা হাত ধরতে চেষ্টা করতেই হঠাৎ আতঙ্কিতের মত পিছিয়ে সরে যায় অম্বি।

অধীর বলে—বল, নেবে আমার উপহার ?

চমকে ওঠে অম্বি।

অধীর—বল অম্বি।

অম্বি মুখ তোলে—পেয়ে গেছি উপহার।

—পেয়েছ ?

—হ্যাঁ।

—কি ?

—জন্মদিনই যার অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে, তাকে আপনি মানুষ বলে ভেবেছেন। তার দুঃখটাকে চিনেছেন। এর চেয়ে বেশি আর কোন উপহার আশা করি না···কিন্তু বড় ভয় করে··· সহ্য করতে পারবো না···আপনি ভুল করবেন না অধীরবাবু।

বলতে বলতে হঠাৎ ছটফট ক'রে ওঠে অম্বি, যেন তার মনের খুশীর ভিতর থেকে একটা ভুলের ভয় হঠাৎ তপ্ত হয়ে কণ্ঠস্বরে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। যার ছায়ার কাছে যাবার অধিকার নেই, তারই ছোঁয়া মুগ্ধ হয়ে গ্রহণ করেছে অম্বি। ভুল হয়েছে, উঁচু জাতের মানুষের মনের একটা দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অপরাধ ক'রে ফেলেছে অম্বি।

কারণ, অম্বি বিশ্বাস করে, সে ছোট রক্তেরই মানুষ। মিথ্যা বলবেন কেন আম্মি ? কিন্তু জেনে-শুনেও চোরের মত এ কি কাণ্ড করে বসলো ? যেন একটা ভয়ংকর অপরাধের ভয় থেকে পালিয়ে যাবার জন্য ছুটে চলে যায় অম্বি।

সত্যিই অধীর ধারণা করতে পারে না, কি ভুল হলো। নিজের মনকে ঠকাতে চায় না অধীর। স্পষ্টই বুঝতে পারে, উপেনবাবুর বাড়িতে, উপেন ও চারুবালার স্নেহে পালিতা ঐ অম্বিকেই, টবের চন্দ্রমল্লিকারই মত যার জীবন, সেই অম্বির সুন্দর মুখটাকেই ভালবেসে ফেলেছে তার মন। গুণ নেই অম্বির, মনে করতেও হাসি পায় অধীরের। পূর্ণ চাঁদের মায়ার মত মায়া নিয়ে, মমতার

লতার মত দুটি সেবার হাত নিয়ে একটি বাড়ির প্রাণের সব প্রয়োজনকে স্নিগ্ধ ক'রে রাখছে যে, তাকে একটা বিস্ময়ের মূর্তির মতই যে মনে হয়।

ঠাট্টা ক'রে একদিন যে-কথাটা অম্বিকে বলেছিল অধীর, প্রতিক্ষণেই বুঝতে পারে অধীর, মোটেই ঠাট্টা নয় সেই কথাটা।—ইচ্ছে করে আমার, কটা দিন জ্বর হয়ে পড়ে থাকি।

হেসেছিল অম্বি—এ আবার কেমন অদ্ভুত ইচ্ছে।

অধীর—তাহলে তুমি একটা ভুল করে ফেলবে, আর সেই ভুলেই তোমার ভুল ভেঙে যাবে।

অধীরের কথার তাৎপর্য সূক্ষ্ম হলেও বুঝতে পেরেছিল অম্বি। যে মেয়ের দুহাতে সেবা আর মমতা ব্যাকুল হয়ে আছে, সেই মেয়ে কি হঠাৎ আগ্রহে ছুঁয়ে ফেলবে না অধীরের জ্বরে বিব্রত কপালের তপ্ততা।

আজ একটু আশ্চর্য হয়, সত্যিই বুঝতে পারে না অধীর, কেন সেদিন অমন ক'রে আতঙ্কিতের মত হাত সরিয়ে নিল অম্বি। অধীরের স্পর্শকে সত্যিই কি ভয় করছে অম্বি?

লাইব্রেরীর কক্ষে বসে অকারণে বিচলিত হয় অধীর। নিজের মনেই বিড়বিড় করে। লিখতে গিয়ে হাতটা যেন অকারণে ছটফট করছে।

—ভুল, কিসের ভুল? নিজের মনে বলতে বলতে উঠে পড়ে অধীর।

অম্বিকেই সোজা ও সুস্পষ্ট প্রশ্ন ক'রে তাহ'লে জেনে নেওয়া উচিত, কিসের ভুল? অমন হেঁয়ালী ক'রে সরে গেলে চলবে না।

অম্বি জানে, হ্যাঁ ভয় করছে অম্বিরই মন। জেনে-শুনে অন্যায় করতে পারবে না অম্বি। ভালবাসার ঐ দুই চক্ষু শুধু তাকিয়েই

তৃপ্ত হোক, ঐ মানুষকে স্পর্শ করার অধিকার নেই অম্বির। অম্বি নিজেকে অন্ত্যজা অস্পৃশ্যা বলেই বিশ্বাস করে।

কিন্তু নিয়তিই যেন করুণাপরবশ হয়ে অম্বির এই ভুল ভাঙাবার জন্য পর পর কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়ে দিয়ে গেল। সমাজ সংসারের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন কোনদিন জাগে নি যে অম্বির মনে, সেই অম্বিই বুঝতে পারে যে, সমাজ আর সংসারও ভুল করে। বিধাতার কাছে ঘৃণ্যা অস্পৃশ্যা ও অন্ত্যজা নয় অম্বি। ধীরে ধীরে এই বিশ্বাসের জাগরণ অম্বির জীবনের বিষণ্ণতাকে আবার সুস্মিত ক'রে তুলতে থাকে। মনে হয়, এবং বিশ্বাসও করে অম্বি, অধীর নামে এই ভালবাসার মূর্তিকে স্পর্শ করার অধিকার তারও আছে। কিন্তু স্পর্শ না করাই ভালো।

গঙ্গার ঘাটে, বেড়াতে গিয়ে অদৃশ্য এক ভক্তকণ্ঠের উৎসারিত গানের ভাষা অম্বির নিঃশ্বাসগুলিকেই যেন একদিন নতুন ভাবনায় চঞ্চল ক'রে তোলে। গাইছেন ভক্ত—জাত-পাতের বড়াই কর কেন সংসারের মানুষ? প্রেমেই আপন হয় মানুষ। সেই পরম আপনের কাছে কেউ ছোট নয়, আর কেউ বড় নয়। গান শুনে অম্বির মন যেন এক আশার দীক্ষা লাভ করে।

এই গানের ভাষা আর সুর শুনে চমকে ওঠেন উপেন।

বিমর্ষ হয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থাকেন। অম্বি প্রশ্ন করে—কি ভাবছো আপ্পি?

উপেন—এখানে আর আমি বেড়াতে আসবো না।

অম্বি—কেন আপ্পি?

উপেন—ঐ সব আজে-বাজে গানের জন্য।

অম্বি—গানের জন্য?

উপেন—হ্যাঁ, ওটা গান নয়, ওটা একটা গালাগালি।

চণ্ডালিকার অভিনয় দেখতে গিয়েছিল অম্বি। অম্বির দুই চক্ষুর বিস্ময় যেন এক আলোকের জগতে পথ খুঁজে বেড়াতে থাকে,

অস্পৃশ্যার হাতের উপহার ঐ স্নিগ্ধ বারি পান করলেন ভিক্ষু। ঐ চণ্ডালিকা মেয়ের বেদনার রূপটিকে যেন দেখতে পেয়েছে অম্বি, তার নিজের অন্তরের গভীরে। অভিনয় দেখতে দেখতে চমকে ওঠে অম্বির মনের কল্পনা। তৃষ্ণার্ত এক জীবনপথিককে বারি দান করছে অম্বি এবং সেই পথিকের মুখটি যে অধীরেরই মুখের মত।

যে ভুলের ভয় কঠিন ক'রে রেখেছিল অম্বির মনের আবরণ, যার জন্য সেদিন অম্বিকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি অধীর, সেই ভুলের মিথ্যাকে বুঝতে পারে অম্বি; সে মিথ্যাকে তুচ্ছ করবার সাহসও যেন মনের ভেতর হঠাৎ জেগে উঠে হাসতে থাকে।

ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একা একা ওপারের সন্ধ্যাকাশের রং দেখছিল অম্বি। অম্বি নিজেই জানে না, কেন সে আজকাল একা একা এইভাবে কিসের জন্য এখানে আসে? গঙ্গার ঢেউ-এর শব্দের মধ্যে কি কোন সান্ত্বনা আছে?

বিকাল হয়ে এসেছে। হঠাৎ চারুবালার কাছে গিয়ে অম্বি বলে—আমি একবার গঙ্গার ঘাটে বেড়িয়ে আসি আম্মি।

চারু—একা যাবি?

অম্বি—হ্যাঁ।

চারু—তাহ'লে যা।

অম্বি চলে যেতেই উপেন রাগ ক'রে চারুবালাকে বলেন—খুবই খারাপ লক্ষণ চারু।

চারু আতঙ্কিত হল।—তার মানে?

উপেন—অম্বির মনে বড় বেশি সাহস জেগেছে। এসব ভাল নয়।

চারু আশ্চর্য হয়ে বলেন—তুমি কি মেয়েটাকে কোন সন্দেহ করছো?

চেঁচিয়ে ওঠেন উপেন—হ্যাঁ, আজকাল আমাদের অপমান দেখতে ভালবাসে। যে গান শুনে আমার মনের সব গর্ব অন্ধ হয়ে গেল, সেই গান শুনতে গেল অম্বি। শত হোক, পরের মেয়ে হ'লো পরের মেয়ে।

চারু—কিছুই বুঝতে পারছি না।

উপেন—একটা সন্ন্যাসী গঙ্গার ঘাটে গান গাইছিল, জাতের বড়াই কর কেন মানুষ, ভগবানের কাছে কেউ ছোট আর কেউ বড় নয়। শুনে তোমার ঐ অম্বির চোখে মুখে আনন্দ! যেন আমাকে ঠাট্টা করার জন্যই…।

চারু—একথা সত্যি। পরের মেয়ে কখনো আপন মেয়ের মত হতে পারে না। কিন্তু তার জন্য দুঃখ ক'রেও কোন লাভ নেই। বড় হয়েছে, বয়স হয়েছে, এখন নিজের স্বার্থ বুঝে নিয়ে যদি পর হয়ে যায়, ভালই। ওকেও দোষ দিই না।

সেদিন আর একটি রহস্য কল্পনাও করতে পারে নি অম্বি। কখন অম্বিকে পথে দেখতে পেয়ে আর অনুসরণ ক'রে অধীরও নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

চমকে ওঠে অম্বি—আপনি কেমন ক'রে এখানে এলেন?

অধীর হাসে—মনে মনে টের পেয়ে।

অম্বি হাসে—কখ্‌খনো না!

অধীর—তাহ'লে রমার কাছ থেকে খবর পেয়ে এসেছি।

অম্বি—তাই বলুন।

কত গল্প করে অধীর। মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকে অম্বি, গান্ধী নামে এক মহাপুরুষের সারা-জীবনের এক সত্য আগ্রহের কথা বলছে অধীর। এক অন্ত্যজা অস্পৃশ্যাকে ঘরের লক্ষ্মীরূপে লক্ষ্মী নাম দিয়েই আপন কন্যারূপে গ্রহণ করেছিলেন যে মহামানব, তার নাম স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এই ঘাট।

গান্ধীঘাটের কাছে বোধিবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আর অধীরের

কাছে গল্প শুনে ধন্য হয়ে যায় অম্বির প্রাণের সব কৌতূহল। বুদ্ধ, যে মহাপুরুষের নামের পুণ্য ধারণ ক'রে রেখেছে এই বটের ছায়া, সেই মহাপুরুষ ছোটবড় ভেদ অস্বীকার ক'রে গিয়েছেন। কত অস্পৃশ্যা ও অন্ত্যজাকে তিনি মহীয়সীর সম্মান দিয়ে গিয়েছেন। শুনতে শুনতে এই বোধিবটের ছায়ার স্নিগ্ধতাকেই পুণ্যময় বলে মনে হয় অম্বির। ভুল ভেঙে যায়, পূর্ণ হয় বিশ্বাসের দীক্ষা। না, তারও অধিকার আছে, শুধু এই পৃথিবীর তরুলতা ও ফুলকে ভালবাসবার অধিকার নয়, ভাবতে গিয়ে লজ্জা পায়, কিন্তু নিজের অন্তরের আনন্দের মধ্যেই বুঝতে পারে, অধীরকেও ভালবাসবার অধিকার তার আছে। আর অধিকার যখন আছে, তখন সেই ভালবাসার মানুষের হাতে হাত রেখে আর কানে কানে একটা বিস্ময়ের উপহার দিতে পারবে না কেন অম্বি ? এমন কুণ্ঠার কোন অর্থ হয় না।

কিন্তু এখানে এত মানুষের চোখের সামনে কেমন ক'রে তার হাতে হাত রাখা যায় ? একটি নিভৃত কি পাওয়া যায় না ?

—এত আনমনা হয়ে কি ভাবছো অম্বি ? অধীরের প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠে অম্বি। ব্যস্তভাবে বলে—চলুন এবার বাড়ি ফিরে যাই।

অধীর—এতক্ষণ আমিও আনমনা হয়ে একটা কথা ভাবছিলুম।

অম্বি—কি কথা ?

অধীর—তোমাকে এত ভাল লাগলো কেন ?

অম্বি—চলুন, অনেক দেরি হয়ে গেল।

অধীর হাসে—এর কোন কারণই যে বুঝে উঠতে পারছি না।

অম্বি—আজ এখানে কিসের জন্য এত বেশি ভিড়; কিছু বুঝতে পারছি না।

অধীর—যদি জানতাম যে, আমাকেও তোমার এইরকমই ভাল লাগে, তবে…।

সামনের পিছনের ও আশেপাশের এত জীবন্ত চক্ষুওয়ালা ভিড়টাকেই যেন হঠাৎ তুচ্ছ ক'রে অম্বির একটা হাত ধরে ফেলে অধীর।

—ছিঃ, এ কি করছেন? যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে শিউরে উঠেছে অম্বি। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আরও ব্যস্তভাবে বলে—চলুন, আম্মি হয়তো এতক্ষণে খুব ভাবতে আরম্ভ করেছেন।

কি অদ্ভুত আর কি রকম নিষ্ঠুর যেন অম্বির এই কুণ্ঠা। গঙ্গার ঘাটে লোকের মেলার মধ্যে অম্বির সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে অম্বিকে যে-সব কথা বলে অধীর, তার কিছুই কি বিশ্বাস করতে পারে নি অম্বি? তবে কেন অমন ক'রে হাত সরিয়ে নিল? অনেক কিছুই কল্পনা ক'রে অধীর কিন্তু কোনটিকেই অম্বির ঐ অদ্ভুত ভীরুতার কারণ বলে মনে হয় না।

তবে ওটা কি অম্বির মনের একটা লজ্জার বাধা? কিন্তু ঐ মেয়ের মনকে তো এমন কিছু লাজুক বলে মনে হয় না। চোখ ছুটোও ভীরু নয়। অধীরের মুখের বেপরোয়া কথাগুলি শোনবার সময় বেশ তো অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে সেই ছুটি চোখ। ভালবাসার কথা শুনতে যার কোন সঙ্কোচ নেই, সে কেন হাত সরিয়ে নেয়? কেন বার বার সেই একই কথা বলে, আপনি না বুঝে বড় ভুল করছেন অধীরবাবু!

গঙ্গার ঘাটে অম্বির পাশে দাঁড়িয়ে অমন সুন্দর সূর্যাস্ত দেখবার আনন্দের মধ্যেও যেন একটা ফাঁকি ছিল; কাঁটার মত মনের ভিতর বিঁধছে সেই ফাঁকি। অম্বির চোখের চাহনি আর মুখের চেহারাটি তো বেশ স্বচ্ছ আর সরল; কিন্তু অম্বি নিজে যেন ঠিক তার বিপরীত। একটা রহস্য, একটা খামকা ভয়ের খেয়াল। ভালবাসার কথা শুনতে ভালবাসে কিন্তু ভালবাসার কথা বলতে পারে না। কাছে এগিয়ে আসে, পাশে দাঁড়ায়, কিন্তু হাত ধরতে গেলেই যেন চমকে ওঠে আর সরে যায়।

ভাবতে গিয়ে নিজেরই উপর রাগ ক'রে যেন নিঝুম হয়ে যায় অধীরের মন। অম্বি নামে ঐ মেয়েকে ভালবাসার অধিকার তার আছে; কিন্তু ভালবাসলেই কি ভালবাসা পাওয়ার অধিকার এসে যায়? সন্দেহ হয়, অধীরের জীবনে হঠাৎ বোধ হয় বড় কঠিন একটা ভুল হয়ে গেল। কোন নারীকে না ভালবেসেও জীবন বেশ সহজে সানন্দে ও হেসে হেসে দিন কাটিয়ে দিতে পারে। অধীরের এই ধারণার অহংকার শাস্তি পাবে আর জব্দ হবে বলেই বোধ হয় অম্বির সঙ্গে অধীরের দেখা হয়েছিল। ভুলতে পারা যায় না এবং চেষ্টা ক'রেও বোধ হয় ভুলতে পারা যাবে না, অম্বি নামে ঐ মেয়ের চোখমুখ চলা-বলা আর হাসি হর্ষ ও গম্ভীরতা দিয়ে তৈরী করা অদ্ভুত এক মধুরতার ছবিকে। সন্ধ্যাকাশের আভা যখন ওর মুখের উপর লুটিয়ে পড়ে তখন মনে হয়, ঐ মেয়ে যেন রঙীন আকাশেরই এক টুকরো শোভা। মৃদু বাতাসের ছোঁয়া লেগে ওর কপালের কাছে কালো চুলের গুচ্ছ যখন আধভাঙ্গা হয়ে ফুরফুর করে, তখন মনে হয় এই মেয়ে যেন একটি মালতী লতা। অধীরের মুখের কথাগুলি শুনতে শুনতে যখন ওর চোখ দুটো অপলক হয়ে যায়, তখন মনে হয় যেন একটা ভরা নদীর প্রাণ শান্তভাবে জোয়ারের শব্দ শুনছে। নিজেকেই প্রশ্ন করে অধীর, তার লজিক-পড়া আর সায়েন্স-জানা মনের সব যুক্তি-বুদ্ধি কি তবে সত্যিই একটা মোহের মধ্যে পড়ে বোকা হয়ে গেল?

কেন ভাল লাগে অম্বিকে? এই প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পায় না অধীর। এবং ভাবতে গিয়ে মনের ভিতরে যেন যত উদ্ধত তর্ক আর যুক্তিগুলি নিজের দুর্বলতার লজ্জায় ছোট হয়ে যায়। অম্বির চেয়ে কত বেশি সুন্দর মেয়ে এই পৃথিবীতে আছে। রমাই তো অম্বির চেয়ে দেখতে বেশি সুন্দর। অম্বির চেয়ে বেশি লেখা-পড়া জানা শত-শত মেয়ে এই শ্যামবাজারে আর ব্যারাকপুরেও আছে। এই জীবনে কত মেয়ের সঙ্গে অধীরের আলাপ-পরিচয়ও

হয়েছে। কিন্তু কোনদিন তো কোন পরিচিতার সুন্দর মুখ স্মরণ করে অধীরের মনে ভাবনার কোন উত্তাপ কোন লজ্জা আর কোন আগ্রহের চঞ্চলতা জেগে ওঠে নি। তবে অম্বি কেমন ক'রে আর কিসের জোরে অধীরের প্রতিক্ষণের নিঃশ্বাসে এই দুর্বার পিপাসা ভ'রে দিল ?

উপেনবাবুব পালিতা মেয়ে অম্বি ; বোধ হয় উপেনবাবুর কোন আত্মীয়-কুটুম্ব অথবা বন্ধুর মেয়ে। এর চেয়ে বেশি গভীরের কোন রহস্য কল্পনা করে নি অধীর। অনুমানে যেটুকু ধারণা হয়েছে, তাই শুধু জেনে রেখেছে অধীর। অম্বির জন্ম-পরিচয় জানবার জন্য কোনদিন বিশেষ কোন কৌতূহলও অনুভব করে নি। উপেনবাবু এবং চারুবালা এবং দিদিমাও অধীরের কাছে অম্বির জন্ম-পরিচয় জানাবার কোন দরকার অনুভব করেন নি। অম্বিকেও কোনদিন এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করে নি অধীর। দরকার কি ? অম্বি তো এখন সত্যিই উপেনবাবুর মেয়ে। অম্বির বাপ-মায়ের পরিচয় জানবার জন্য প্রশ্ন করারও কোন অর্থ হয় না। শুধু অম্বির মনে ব্যথা দেওয়া হয়।

কিন্তু অম্বিকে যেন আজও ঠিক চিনতে পারা গেল না। অম্বি যেন তার জীবনের অনেক কিছু অধীরের কাছে ধরা পড়িয়ে দিয়েও জীবনের কোন নিবিড় একটা রহস্যকে দুর্লভ রত্নের মত গোপন ক'রে রাখতে চায়। চৈত্র সন্ধ্যার দমকা বাতাসেব মত হঠাৎ এসে সৌরভ ছড়িয়ে দেয় ঠিকই কিন্তু তার পরেই যখন দূরে পালিয়ে যায়, খুঁজতে গেলে আর পাওয়া যায় না।

রাগ হয় অম্বির উপর, কিন্তু কি আশ্চর্য, অম্বিকে ভুলে যেতে ইচ্ছে করে না কেন ? অম্বির হাতের সামান্য একটা স্পর্শের জন্য এই ব্যাকুলতা কেন ? এই ভালবাসা আব ভাললাগা মোহগুলি কি কোন নিয়মের ধার ধাবে না ? অধীরকে আনমনার মত লাইব্রেরী ঘরের নিভৃতে চুপ ক'রে বসে থাকতে দেখে অনেকবার

ঠাট্টা করেছেন ডক্টর ব্যানার্জী—কি হ'ল ফ্রেণ্ড? কা'কে ভাবছো?

অধীর হাসে—নিজেকে।

ডক্টর ব্যানার্জী—অর্থাৎ অন্ত একজনকে ভাবতে কেন ছাই এত ভাল লাগছে, তাই না?

অধীর—আমি নিজের মনের সমস্যাই ভাবছি ডক্টর ব্যানার্জী।

ডক্টর ব্যানার্জী—আমিও যে তাই বিশ্বাস করছি। তাহ'লে এতদিনে সমস্যায় পড়েছ! উইশ ইউ গ্র্যাণ্ড সাকসেস!

বলতে বলতে চলে যান ডক্টর ব্যানার্জী। কিন্তু অধীরের মন থেকে সেই প্রশ্নটা যে চলে যাবার নামও করে না। কেন ভাল লাগে অম্বিকে? মনে হয় অধীরের, এর চেয়ে বেশি কঠিন প্রশ্ন বোধ হয় এই সংসারেই নেই। এবং এই প্রশ্নের উত্তর নেই।

যদি ভুল হয়ে থাকে, হোক্। এই ভুলের শেষ না দেখা পর্যন্ত বোধ হয় ভুল ভাঙ্গবে না। তবে আর দেরি ক'রেই বা লাভ কি? তাড়াতাড়ি একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলাই উচিত। অম্বির কাছে গিয়ে, অম্বিকে একটি নিভৃতে ডেকে নিয়ে এসে সোজা স্পষ্ট ক'রে জিজ্ঞাসা করতে পারা যায়; আমার ভালবাসাকে তুমি ভুল মনে করছো কেন? কেন হাত সরিয়ে নাও? কিসের আপত্তি?

তার হাতে হাত রাখবার জন্য কেন এই ব্যাকুলতা? ভাবতে গিয়ে নিজের মনকে শত ধমক দিয়েও কেন বোঝাতে পারে না অম্বি, এবং বোধ হয় নিজেও বুঝতে পারে না, তার এতদিনের ভীতু জীবনটাকে এ কোন্ ভয়ানক লোভে পেয়ে বসলো? ইচ্ছা করে, এবং কল্পনা করতেও ভালই লাগে অম্বির, হঠাৎ একটা জ্বর এসে এই শরীরটাকে একেবারে অসহায় ক'রে বিছানার উপর শুইয়ে রাখুক, অন্তত পাঁচটা দিন। আসুক অধীর, অম্বির মুখের করুণ ও উদাস হাসির দিকে তাকিয়ে ছলছল করুক ওর ওই দুই চক্ষু; তারপর হঠাৎ অম্বির একটা হাত টেনে নিয়ে বসে থাকুক অধীর। যদি তাই হয়, যদি সেই সুযোগ পাওয়া যায়, এবং কেউ যদি দেখে

না ফেলে, তবে অধীরের হাতের সেই ছোঁয়া মনে মনে বরণ ক'রে নিয়ে অম্বির বোধ হয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মরে যেতেও ভাল লাগবে।

শুধু ঘরের নিভৃতে বসে জাগা-মনের ভাবনাগুলির সঙ্গে নয়, মাঝরাতের আর ভোরের ঘুমের স্বপ্নের সঙ্গেও যেন অম্বির মনটা লড়াই ক'রে ক'রে হাঁপিয়ে ওঠে আর লজ্জা পায়। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়, বিছানার উপর উঠে বসেই শাড়ির আঁচল দিয়ে ঠোঁট মোছে। শিউরে ওঠে শরীরটা; আঃ, স্বপ্নও এত স্পষ্ট হয়!

নিজেরই মনের নতুন দুঃসাহসগুলির রূপ দেখে আশ্চর্য হয় অম্বি। বুকের ভিতরে সব নিঃশ্বাসের আনাচে-কানাচে, কিংবা বোধ হয় এই রক্তধারার মধ্যেই এই দুঃসাহস অনেক অভিমানে লুকিয়ে পড়ে ছিল। আম্মি বলেছেন—তার দেহের ছোঁয়াকেই ভয় করে উঁচু-জাতের পৃথিবীর যত প্রাণ। কি অদ্ভুত নিষ্ঠুর ভয়! গাছের পাতা ও ফুলের ছোঁয়াকে কুড়িয়ে নিয়ে বুকে আর মাথায় তুলে নিতে পৃথিবীর কোন মহাপবিত্রের মনেও কোন আপত্তি নেই। অম্বির দেহটা কি ঐ পাতা আর ফুলের চেয়ে কম জীবন্ত? তবে কিসের এই ভয়? অধীরের মনেও কি সেই ভয় আছে?

অধীরের মনে ওরকম কোন ভয় আছে কি না বোঝা যায় না। বুদ্ধ আর গান্ধীর কথাগুলিকে কি অধীরও সত্যিই বিশ্বাস করে? কিংবা অধীরের কাছে ওসব কথা শুধু কতগুলি গল্পের কথা? ভুলেও তো একবার অধীর একথা নিজের মনের জোর নিয়ে বলতে পারলো না যে, ঠিকই বলেছিলেন বুদ্ধ আর গান্ধী, জন্ম আর জাতের জন্য মানুষ বড় হয় না, ছোটও হয় না। সত্যিই অম্বির মনের চিন্তাগুলি যেন মাঝে মাঝে একটা দুঃসহ অভিমান সহ্য করতে চেষ্টা করে। মানুষ না হ'য়ে বাগানের একটা চন্দ্রমল্লিকা হ'য়ে জন্ম নিলেই তো ভাল ছিল। তাহ'লে সারা পৃথিবীর চোখের সামনে অধীরের বুকের উপর লুটিয়ে পড়তে অম্বির জীবনে কোন বাধা থাকতো না, কোন অন্যায়ও হতো না।

এ কি হ'লো মনের দশা? সকালবেলার খবরের কাগজের ছবি আর লেখাগুলির উপর চোখ আর মনের আগ্রহ ধরে রাখবার চেষ্টা ক'রেও ধরে রাখতে পারে না অম্বি! মনটা যেন একজনের পায়ের শব্দ শোনবার জন্য ছটফট করছে। কখন আসবে অধীর? আসুক একবার। আজও কি একটি নিভৃতে দাঁড়িয়ে অধীরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার সুযোগ পাওয়া যাবে না?

অম্বির এই শান্ত দেহটাই যেন বিদ্রোহ ক'রে উঠতে চায়। অধীরকে স্পর্শ করবার তার অধিকার নেই, এই মিথ্যা অভিশাপকে চূর্ণ ক'রে দিতে ইচ্ছা করে। আর আপত্তি করবে না, হাত সরিয়ে নেবে না অম্বি।

ভিতরের ঘরে তখন পিসিমা উল্লাসের সঙ্গে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করছিলেন যে, নাতি তাঁর বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। একেবারে স্পষ্ট করে মুখ খুলেই এবার বলেছে।

পিসিমা বলেন—আমি জিজ্ঞেস করলুম, তাহলে বল পাত্রী দেখি। নিজের মুখেই বললে, পাত্রী দেখাই আছে। বলতে বলতে আহ্লাদে গলার স্বর কেঁপে ওঠে পিসিমার।

পিসিমা—রমাকে খুবই মনে ধরেছে বুঝতে পারছি। এইবার তোমরা একটা দিনক্ষণ ঠিক কর।

উপেন—আর অম্বির জন্যে যে পাত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন?

পিসিমা—সে তো ঠিকই আছে। আজ বল আজ, কাল বল কাল। পাত্র দেখ, দিন ঠিক কর।

আলোচনা করতে করতে সকলে বাইরে আসেন। অম্বিকে লক্ষ্য ক'রে চারুবালা বলেন—অধীর যদি আসে, তবে এক মুহূর্তও যেন এখানে আর দেরি না করে।

একটি কার্ড অম্বির কাছে দিয়ে উপেন বলেন—অধীরের নেমন্তন্ন পত্র। রমাদের কলেজের স্পোর্টস দেখার নেমন্তন্ন। আমরা চললাম। অধীরকে বলবি, অবশ্যই যেন যায়।

চারুবালা বলেন—বলবি, না গেলে রমাও দুঃখ করবে।

দেখে চমকে ওঠে অম্বি। অধীর আসছে। কিন্তু না, অসম্ভব। উঁচু জাতের ঐ মানুষের মনের একটা ভুল ধারণার সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকানো উচিত নয়। তার হাতে হাত রাখা দূরে থাকুক, তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করাও উচিত নয়। যদি কোন দাবি করে অধীর, তবে অম্বি আজ স্পষ্ট করেই বলে দেবে, তোমার দাবি সত্য, কিন্তু আমিই যে মিথ্যা। ক্ষমা কর, এত কাছে এস না, একটু দূরেই থাক।

বারান্দার এই দিকে, এই থামের পাশে যেখানে একা চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়তে চেষ্টা করছে অম্বি, সেটা যে সত্যিই একটা নিবিড় নিরালা। যদি সোজা এসে এখানেই অম্বির কাছে দাঁড়ায় অধীর? ভয় পায় অম্বি। আজ অম্বি তার নিজেরই স্পর্শলোলুপ হাতটাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কে জানে অধীরকেই হতভম্ব ক'রে দিয়ে কোন্ ভুল ক'রে ফেলবে অম্বি? চেয়ার থেকে উঠে, ভিতরের ঘরের দিকে ছুটে চলে যায় অম্বি।

যেন একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছে অধীর। আজ স্পষ্ট ক'রে অম্বির কাছে তার জীবনের আকাঙ্ক্ষার কথা ঘোষণা ক'রে দিয়ে যাবে। অম্বিই তার জীবনের স্বপ্ন। অম্বিই তার জীবনের প্রয়োজন। এর মধ্যে কোন ভুল নেই।

ঘরে কেউ নেই, এমনই একটি অবাধ নিভৃত তৈরী হয়ে আছে। এবং অধীরও এসেছে তার জীবনের আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট ক'রে ঘোষণা ক'রে দেবার জন্য, নইলে শান্তি পাচ্ছে না অধীর।

অধীর সোজা অম্বির কাছে এসে দাঁড়ায়।—আমি একটুও ভুল করছি না অম্বি। ডাক তোমার আপ্পিকে, ডাক তোমার আম্মিকে, সবার সামনেই জানিয়ে দিয়ে যাই, আমি একটুও ভুল করছি না।

—কেউ নেই বাড়িতে।

—তুমিও কি নেই?

—আমি তো আছিই। যাব কোথায়?

—আমার কাছে।

চমকে ওঠে, চুপ ক'রে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি।

—বল অম্বি, তোমার আপত্তি নেই। যদি একটু আপত্তি থাকে, তবে এখনই বলে দাও।

—একটুও না অধীরবাবু। একথা আমাকে দিয়ে বলিয়ে কি সুখ পাচ্ছেন আপনি? আজও যদি না বুঝে থাকেন, তবে কোন দিনই বুঝবেন না।

অধীরের মনের সব বিমর্ষতা মুছে যায়। প্রণাম করে অম্বি। বাধা দেয় অধীর, কিন্তু অম্বি শোনে না।—সেদিনের ভুল ক্ষমা কর, আজ তোমাকে ছোঁবার অধিকার পেয়েছি।

—কে দিল অধিকার?

—দিয়েছে আমার মন।

অধীর বলে—আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি অম্বি। তোমার খোঁপায় একটি চন্দ্রমল্লিকা, কপালে খয়েরের টিপ তারার মত আঁকা, চাঁপা রঙের ঢাকাই তাঁতের শাড়ি, তার মধ্যে হাস্নু‌না-হানার সুগন্ধ। এই সুন্দর মূর্তি নিয়ে তুমি আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছ। বলতে পার, আমার এই স্বপ্নের মানে কি?

—মানে হলো, তুমি সুন্দর।

—কথা এড়িয়ে যেও না। বল, কবে ঐ স্বপ্নের মতো ক'রে তোমাকে কাছে পাব।

—তোমার যেদিন ইচ্ছা।

—এই মাসেই, এই আষাঢ়ের কোন শুভদিনে।

—বেশ।

—তাহলে দিদিমাকে বলি।

—বলো।

চলে যাচ্ছিল অধীর। অম্বি হঠাৎ বলে ইস্, কী সাংঘাতিক ভুল!

রমাদের কলেজের স্পোর্টসে যাবার জন্য নিমন্ত্রণের কার্ডটা অধীরের হাতে তুলে দিয়ে অম্বি বলে—আম্মি বার বার বলেছেন, এখনি যাও, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

অধীর কি-যেন ভাবে। অম্বি বলে—যাও, নইলে রমাও দুঃখ করবে।

স্পোর্টস-এর মাঠের একপাশে এক জায়গায় পাশাপাশি চেয়ারে বসে চারুবালা ও উপেন অধীরের প্রতীক্ষা করছিলেন।—অধীর কি ভুলেই গেল?

কিন্তু পরমুহূর্তেই চারুবালা ও উপেন খুশী হয়ে দেখতে পেলেন, অধীর এসেছে। রমার তখন হার্ডল্ রেস শুরু হয়েছে। ফার্স্ট হলো রমা।

চারুবালা অধীরের দিকে তাকিয়ে বলেন—আমি জানতাম, রমা ফার্স্ট হবে।

রমা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে প্রশ্ন করে—অম্বি আসে নি?

তারপর অধীরকে দেখেই ছেলেমানুষী ভঙ্গিতে হঠাৎ বলে ফেলে—আপনি এলেন কেন? উঃ, কি ভীষণ লজ্জা করছে আমার! এইবার আপনি চলে যান।

অধীর হেসে ফেলে—তাহ'লে আমি চলি।

চারুবালা ভ্রূভঙ্গি ক'রে মেয়েকে ধমক দেন—কথা বলার কি ছিরি?···ওর কথা তুমি গ্রাহ্যি করো না অধীর।

চোখ বেঁধে হাঁড়ি ভাঙ্গবার খেলা। রমা লাঠি হাতে হাঁড়ি ফাটাবার জন্য ভুল ক'রে মাঠের কিনারায় এসে পড়ে। চারুবালা

ভ্রূকুটি ক'রে হাসতে থাকেন, রমা যেন একটা পাগল অন্ধের মত আই চাই করতে করতে বাঁধা চোখ নিয়ে আর লাঠি ঘুরিয়ে এই দিকেই আসছে, অথচ হাঁড়িটা মাঠের মাঝখানে পোস্টের গায়ে নির্বিকার দুলছে।

কি বিশ্রী ভুল করছে রমা! ভুল আন্দাজ করছে। যেন আকাশে বাড়ি মারবার জন্য লাঠি তুলেছে।

ও কি? ওখানে যে অধীর দাঁড়িয়ে আছে। আসর সুদ্ধ দর্শক হাসতে থাকে। প্রায় অধীরেরই মাথা লক্ষ্য ক'রে লাঠি তোলে রমা। এক লাফ দিয়ে সরে গিয়ে অধীর হাসতে থাকে।

ঘটনা দেখে হেসে ফেলেও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান চারুবালা। উপেনের কানে কানে বলেন—রমাটা কি ইচ্ছে ক'রে অধীরকে অপ্রস্তুত ক'রে সরিয়ে দিতে চাইছে? ওর মতলব কি?

উপেন বলেন—তুমি কেন মিছিমিছি ছেলেমানুষের ইচ্ছে-অনিচ্ছে বুঝবার চেষ্টা করছো? বাইরে থেকে দেখে ওসব কিছু বোঝা যায় না।

চারুবালা—আমার যেন কেমন ঠেকছে। মেয়ের বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর আমার বিশ্বাস নেই।

উপেন—না, না, তুমি খামকা ওসব কথা ভাবছো।

তখন একা ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রে গান গাইছিল অম্বি, গলা খুলে। আজ তার জীবনের পরিণাম একেবারে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। তার যে ভাগ্যের দোষ দেখে আপ্পি আর আম্মি কত চিন্তা করেছেন, কত আক্ষেপ করেছেন, সেই ভাগ্যের শুভ স্বরূপের সংবাদ শুনতে পেয়ে কত খুশী হয়ে উঠবেন দুজনে, আপ্পি ও আম্মির মুখ হেসে উঠবে। সেই কল্পনার আনন্দ যেন অম্বির এতদিনের সাবধানতায় বাঁধা মনকে মাতিয়ে দিয়েছে।

রেডিও হতে উৎসারিত সঙ্গীতের একটি স্তবক শুনে নেয় অম্বি।

তার পরেই রেডিও বন্ধ ক'রে সেই গান গাইতে থাকে। তার পর আর এক স্তবক।

বাড়ির বারান্দায় উঠে বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ান চারুবালা ও উপেন।—কে গাইছে গান? অম্বিও গাইতে পারে না কি?

চারুবালা—অম্বি নয়। রেডিওর গান।

সন্দেহ মেটাবার জন্য পর্দার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখেন চারুবালা। ফিরে এসে বলেন—হ্যাঁ, অম্বিই গাইছে।

উপেন গায়ের চাদর নামিয়ে অপ্রস্তুতের মত স্বরে বলেন—অম্বি কি কখনো গানের মাস্টারের কাছে গান শিখেছিল?

—না। কোনদিন তো দেখি নি। অম্বিকে কখনো গান শেখানো হয় নি।

—তবে, এ কিরকম হলো? শেখানো হলো না, তবুও শিখলো। তা ছাড়া, রমার চেয়েও ভাল গলা পেল?

এটাও যেন চারুবালা ও উপেনের জীবনের একটা সংকল্পের পরাভব। অম্বির গলার সুন্দর গান শুনে আনন্দিত হতে পারছেন না। নিজেদের বুকের ভিতরেই যেন একটা কাঁটার খোঁচা বিঁধছে। হঠাৎ গান বন্ধ হয়। বোধ হয় বুঝতে পেরেছে অম্বি, আপ্পি ও আম্মি ঘরে ফিরেছেন। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে ভিতরের বারান্দার দিকে আসতে থাকে অম্বি, এবং শুনতে পায়, ঠিক, আপ্পি আর আম্মিই কথা বলছেন। থমকে দাঁড়ায় অম্বি।

তার পরেই শিউরে ওঠে অম্বির সারা শরীর। যেন এক জ্বালাময় শিহরণ। দুঃসহ বেদনায় আবিল হয়ে যায় চোখের দৃষ্টি। আপ্পি আর আম্মির আলোচনার ভাষা থেকে একটি যে নিদারুণ তথ্য অম্বির কানে এসে বেজেছে, সেই তথ্যের জ্বালা নিষ্ঠুর কৌতুকে পুড়িয়ে দিচ্ছে অম্বির বুকের পাঁজর।

উপেন—আমার ইচ্ছা, রমা পরীক্ষাটা দিয়ে নিক, তারপর একটা ভাল দিন বুঝে…।

চারু—কিন্তু পিসিমার ইচ্ছে, শুভস্য শীঘ্রং, যত শিগগির হয় তত ভাল। বিয়ের পরেও পরীক্ষা দিতে পারে রমা। আর অধীরের মত বিদ্বান ছেলের বউ যে হবে, তার পড়াশুনার কোন অসুবিধেও হবে না।

উপেন—এটা আমাদের ভাগ্যি বলেই মানতে হবে যে, রমার জন্য অধীরের মত পাত্র পাওয়া গিয়েছে।

সবই শুনতে পায় অম্বি। ছুটে চলে যায়, যেন মরিয়া হয়ে ছুটে উপরতলার ঘরে এসে দুহাত দিয়ে মাথাটা নিষ্ঠুরের মত টিপে ধরে। তার পরেই টেলিফোনের রিসিভার তুলে নম্বর ডাকে। অধীরকে আহ্বান করে।

—শুনুন, আপনি কি সত্যিই আমার সব কথা বিশ্বাস করেছেন।···

চোখ দিয়ে জল গড়ায়, কিন্তু নিজেকে কঠোর ক'রে, যেন আত্মহত্যার প্রয়াসের মতই অম্বি জানিয়ে দেয় অধীরকে, আমাকে যদি বাঁচতে দিতে চান, তবে একথা এখন কাউকে বলবেন না। না কাউকে না। দিদিমাকে নয়, আপ্পি আম্মিকেও নয়। পায়ে পড়ি আপনার, আপনি শুধু চুপ ক'রে থাকুন···কতদিন? জানি না, ভগবান জানেন। হ্যাঁ, আসবেন বৈকি···একশো বার আসবেন।

জীবনে এই প্রথম নিজেকে অপরাধিনী মনে করেছে অম্বি। কি ভয়ংকর ভুলে আপ্পি আর আম্মির মনের একটা বড় সাধকে যেন হত্যা করতে চলেছিল অম্বি। কিন্তু সময় থাকতেই ধরা পড়ে গিয়েছে অম্বির সেই ভুল। রমাকে অধীরের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য তৈরী হয়েছেন, অনেক আশা নিয়ে দিনক্ষণের অপেক্ষা করছেন আপ্পি আর আম্মি। এই সত্য যদি প্রথমেই এমনই আকস্মিক কোন ঘটনায় বুঝতে পারতো অম্বি, তবে অম্বি অধীরের মুখের দিকেও তাকাতো না, তাকাতে যতই ইচ্ছে হোক, আর মনের

ভিতর যে স্বপ্ন যতই কান্না কাঁদুক না কেন। নিজের উপর কঠোর হবার শক্তি আছে অস্থির। এতদিন সেই শক্তি নিয়েই অস্থির জীবন চলছে।

নতুন ক'রে আর একবার ভয়ানক কঠোর হতে পারবে না কেন অস্থি? নিশ্চয়ই পারবে। আপ্পি আর আম্মির মনের আশাকে এখন নিজের প্রাণের রক্ত দিয়েই সফল ক'রে তুলতে হবে। রমার সঙ্গে অধীরের বিয়ে হবে, এই আকাঙ্ক্ষিত একটা ঘটনাকেই এখন প্রতিমুহূর্তের চিন্তা আর চেষ্টা দিয়ে সত্য ক'রে তুলতে হবে। এই হবে অস্থির জীবনের এক নতুন ব্রত। দুঃসহ, কিন্তু হাসিমুখেই এই ব্রত পালন করবে অস্থি।

হ্যাঁ, হাসিমুখেই এই বাড়ির জীবনের পরিণামকে যেন জোর ক'রে পথ ঘুরিয়ে দেবার জন্য অস্থির প্রতিদিনের চেষ্টা চলতে থাকে। রমার কাছে অধীরের প্রশংসা, আর অধীরের কাছে রমার প্রশংসা। যেন জাদুকরীর মত রমার মনে সেই মোহ সঞ্চারিত করতে চায় অস্থি, যে-মোহ ভালবাসা হয়ে ফুটে উঠতে পারে। অধীরের মনের উপরেও যেন সেই সূক্ষ্ম ও জটিল মায়া রচনার পরীক্ষা চালায় অস্থি। অধীরের কাছে রমাকে মোহনীয় ও লোভনীয় ক'রে তোলবার জন্য নানা কথা ও কাহিনী ও ঘটনাব পরিবেশন করে অস্থি।

পড়ার ঘরে রমার কাছে গিয়ে অনেক চিন্তা আর উদ্বেগের ভঙ্গিতে অস্থি বলতে থাকে—অধীরবাবু তোর এত প্রশংসা করে কেন?

—প্রশংসার যোগ্য বলে, এর মধ্যে কেন আবার কি?

—না, অধীরবাবু কেন করেন?

—হরির মা'ও তো আমার প্রশংসা করে।

—ঠাট্টা না ক'রে তোমার একটু বোঝা উচিত রমা।

—তুই কি বোঝাতে চাস আমাকে?

—অধীরবাবুর মত ভাল মানুষ হয় না।

—তা কে না জানে? বিদ্যা অনেকেরই থাকে, কিন্তু অমন ভাল মন খুব কম দেখা যায়।

—আমার ভয় হয়, এরকম একটা ভাল মনও শেষ পর্যন্ত যদি কোন দুঃখ পায়।

—তার মানে?

সহসা উত্তর দিতে পারে না অম্বি। অম্বির অনুরোধগুলির মধ্যে যেন চাপা কান্নার সুর লুকিয়ে রয়েছে, অথচ অম্বি যেন এক নতুন হর্ষের সুর দিয়ে ঢাকতে চাইছে সেই করুণতা।

রমার কত প্রশংসা করে অধীর, রমার কাছে সে-কথা বর্ণনা করতে গিয়ে অম্বি হঠাৎ আরও স্পষ্ট ক'রে দেয় তার চেষ্টার ইঙ্গিত। —অধীরবাবুর কাছে তুই যদি রোজ পড়া শিখে নিতে পারিস, তবে কলেজের সব মেয়ের মধ্যে তুই নিশ্চয়ই ফার্স্ট হবি।

রমা বলে—হ্যাঁ, কিন্তু তুই যদি অধীরবাবুর কাছ থেকে পড়া শিখিস তবে কি হবে বুঝতে পারিস?

অম্বি—কি?

রমা—তবে তুই এই পৃথিবীর সব মেয়ের মধ্যে ফার্স্ট হয়ে যাবি।

বিব্রত হয় অম্বি। কিন্তু উপায় খোঁজে, আশা ছাড়ে না।

অধীর যেদিন এল, সেদিন আবার নতুন ক'রে অম্বি তার পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য তেমনি সূক্ষ্ম প্রয়াসের কুহক সৃষ্টি করে। রমার মত ভাল মেয়ে হয় না। রমাকে যে-মানুষ আপন ক'রে নেবে, সে-মানুষ জীবনে সুখী হবেই হবে। রমা যে-সব

প্রশংসা করেছে অধীরের নামে, সেই সব প্রশংসার কথাই অধীরকে বিচিত্র এক উৎসাহ নিয়ে শোনাতে থাকে অম্বি।

রমার পড়ার ঘরে অধীর এসে ঢুকতেই রমা বলে—অম্বিকে ডেকে দিচ্ছি।

অধীর হাসে—তুমি কোথায় যাচ্ছ?

রমা—আমার কথা ছেড়ে দিন। হয় তো ডলিদের বাড়ি চলে যাব। আবার চণ্ডালিকার রিহার্সাল আরম্ভ হয়েছে।

রমা চলে যায়, এবং একটি মিনিট পরেই উদাসভাবে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ায় অম্বি। অম্বি বলে—আপনি কিছু মনে করবেন না অধীরবাবু। একটু অপেক্ষা করুন, এখুনি আপ্পি আপনার সঙ্গে গল্প করবার জন্য আসবেন।

অধীর হাসে—তার মানে, আপনি এখন এখানে আমার কাছে বসে দু'টো কথাও বলতে পারবেন না, এই তো?

অম্বি—সত্যিই আমার কাজ আছে অধীরবাবু, আপনি বিশ্বাস করুন।

অধীর—আপনার কথা আমি একটুও বিশ্বাস করলাম না, বিশ্বাস করুন।

অম্বি—রমাকেও বিশ্বাস করা আপনার উচিত হয় নি।

অধীর—তার মানে?

অম্বি—ও যে একটা ছুতো ক'রে চলে গেল, বুঝতে পারেন নি?

অধীর—বুঝতে পারলেও আমার কি করবার আছে?

অম্বি—রমাকে আপনি বুঝতে পারছেন না। আপনার সঙ্গে দু'টো কথা বলবার জন্য কত আশা ক'রে বসে থাকে রমা; আপনি শুধু ওর আজে-বাজে কথাগুলিকেই দেখতে পান, ওর মনটাকে দেখতে পান না।

গম্ভীর হয় অধীর।

মনে হয় অম্বির, তার এই ব্রত সফল হয়, যদি আর একটু চেষ্টা

করা যায়। যদি একটু কঠোর হওয়া যায়, যদি তার মনের কান্নাকে আরও ভাল ক'রে চেপে অধীরের মনে রমার নামে এক নতুন মোহ সৃষ্টি করতে পারা যায়।

এক এক সময় অধীরের কথা ও মন্তব্য থেকে যেন আশার আভাস পায় অম্বি। মনে হয়, অধীরের মনে রমার সম্বন্ধে একটা আকর্ষণের মায়া বোধ হয় জাগছে। এই সত্য কল্পনা করতে একদিকে যেমন নিশ্চিন্ত হয় অম্বি, তেমনি আর একদিকে মনে হয়, কি দুঃসহ এই সত্য!

রোজই আসছে অধীর, এবং অধীরের একমাত্র কৌতূহল হলো, কেন অম্বি তার বিয়ের প্রস্তাবকে বাধা দিল? বিষণ্ণ হয়ে আছে অধীরের মন। সুযোগ খোঁজে, সোজা প্রশ্ন ক'রে অম্বির কাছ থেকে এই রহস্যের অর্থ জেনে নিতে চায়, কিন্তু ঠিক সুযোগ পায় না। যতবার নিভৃতে দেখা পেয়ে কথাপ্রসঙ্গে এই প্রশ্ন উত্থাপন করতে চেয়েছে অধীর, ততবারই কোন না কোন ঘটনায় প্রশ্ন অসমাপ্ত থেকে যায়। হয় চা খেতে ডাক দেন চারুবালা, নয় অম্বি সরে যায় কোন কাজের অজুহাতে।

ব্যারাকপুরের গঙ্গার কলস্বর যখন অনেক রাতের নীরবতার মধ্যে হঠাৎ এক একবার বেজে ওঠে, তখন ঘুম ভেঙ্গে যায় অম্বির, এবং আর ঘুম আসে না। গঙ্গার ঘাটে একা একা বেড়াতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে অম্বি। গঙ্গার ঘাটেও এখন আর সূর্যাস্ত দেখবার সুযোগ পাওয়া যায় না। আষাঢ়ে মেঘের ঘটায় কালো হয়ে আছে আকাশ। কিন্তু গঙ্গার ঢেউ তো আছে, আর জলের শব্দে অদ্ভুত সান্ত্বনার ভাষা আছে। কাছে গিয়ে দেখতে আর শুনতেও ইচ্ছা করে; কিন্তু না, আর না। ভয় হয়, পিছন থেকে হয়তো ব্যস্তভাবে ছুটে আসবে একটি সুন্দর মানুষের ছায়া।

একেবারে পাশে এসেই আবার সেই একই কথা জিজ্ঞাসা করবে—তুমি এমন ক'রে লুকিয়ে থাকছো কেন ?

কিন্তু সে এখন কোথায় ? কলকাতাতেই আছে কি ? অনেক দিন হলো, এই বাড়িতে আর আসে নি অধীর। আপ্পি আর আম্মির কথাবার্তা থেকেও কোন সংবাদ ধরতে পারে না অম্বি। আশ্চর্য লাগে, এই বাড়ির কারও মন একটুকুও বিচলিত হয় না কেন ?

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই বুঝতে পারে অম্বি, এই বাড়ির মন সত্যিই বিচলিত হয়ে উঠেছে। শ্যামবাজার থেকে পিসিমার চাকর একটা চিঠি নিয়ে এসেছে। অধীরের অসুখ। খুব জ্বর আর মাথাধরা।

বাড়িসুদ্ধ সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, আপ্পি আর আম্মি তৈরী হয়েছেন, এখুনি শ্যামবাজারে গিয়ে অধীরকে একবার দেখে আসবেন।

দেখে খুশী হয় অম্বি। কিন্তু এই খুশীর ভিতরেই যেন একটা কাঁটা লুকিয়ে রয়েছে। অধীরকে দেখতে যাবার অধিকার এই পৃথিবীর সবারই আছে, শুধু নেই অম্বির।

ঘরের ভিতরে ঢুকে আবার বিছানার উপর লুটিয়ে শুয়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছা করে। নিজের এই হাত দু'টোকেই যেন আবর্জনা বলে মনে হয় অম্বির। সে মানুষ যে নিজেই শখ ক'রে চেয়েছিল এই জ্বর, শুধু অম্বির হাতের একটা ভুল দেখবার লোভে। অধীরের কপাল অম্বির হাতের ছোঁয়া লুটিয়ে লুটিয়ে জ্বরের সব জ্বালা আর তাপ স্নিগ্ধ ক'রে দেবে, সেই মানুষের এমন একটি স্বপ্নকেই আজ তুচ্ছ ক'রে দূরে সরে থাকবে অম্বি।

কিন্তু বুঝতে ভুল হয় নি অম্বির। এই অসুখের খবর যে অম্বিকেই কাছে পাওয়ার আহ্বান। কিসের আশায়, কার জন্য, এই খবর এসেছে, কল্পনা করতে অসুবিধা নেই। তবু যেতে পারবে

না অম্বি, এবং সেই মানুষও অম্বির এই হৃদয়হীনতা দেখে হতভম্ব হয়ে অম্বিকে চিরকালের মত অবিশ্বাস করুক।

হঠাৎ রমা এসে বলে—আমি যাচ্ছি অম্বি।

—কোথায়?

—অধীরবাবুর অসুক, একবার দেখে আসি।

অম্বি.অপলকভাবে তাকিয়ে থাকে। রমার চোখের ঐ চঞ্চলতা কি সত্যিই একটা ব্যাকুলতা? রমার মনে তবে কি সত্যিই···।

রমা বলে—তুই যাবি না?

অম্বি—না।

রমা—কেন?

অম্বি—কেন আবার কি? যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না।

রমা গম্ভীরভাবে বলে—ইচ্ছে যদি না করে তবে না যাওয়াই ভাল।

চলে গেল রমা। আপ্পি আর আম্মির সঙ্গে একই গাড়িতে বসে রমা চলে যাচ্ছে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে এই রহস্যটাকে বুঝতে চেষ্টা করে অম্বি, এবং বুঝতে পারে, হ্যাঁ, রমার মন আজ অধীরের কাছে গিয়ে বসবার জন্য সত্যিই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অধীরের জন্য রমার মনে এতদিনে একটা মায়াভরা কৌতূহল দেখা দিয়েছে।

অম্বির চেষ্টা আর ইচ্ছাই সফল হয়েছে। জানালার কাছে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল অম্বি, সে নিজেই জানে না। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে একটা অন্ধ ভিখারী চেঁচিয়ে গান গাইছে আর বৃষ্টি পড়ছে। ভিখারীকে চাল দিয়ে বিদায় করার পর, আর ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরে ভিজবার পর অম্বির চোখ থেকে যেন বেদনার ঘোর কেটে যায়। ভালই হলো। যেন একটা মানত সফল হলো এতদিনে।

তবু একটি প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর পেলেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে

ঝরাবে অম্বির সব উদ্বেগ। অধীরও কি তবে রমারই আশায় তার জ্বরের শরীর নিয়ে দরজার দিকে তৃষ্ণার্তের মত উৎসুক হয়ে তাকিয়ে বিছানার উপর চুপ ক'রে পড়ে আছে? কে জানে, এতক্ষণে বোধ হয় রমাকে দেখতে পেয়েই শান্ত হয়ে গিয়েছে অধীরের চোখের প্রতীক্ষা।

তাই যেন হয়। ফটক থেকে ফিরে গিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকতেই ঝি চেঁচিয়ে ওঠে—এ কি গো অম্বিদি? মিছিমিছি ভিজছো কেন?

অম্বি হাসে—ভয় নেই, আমার জ্বর হবে না।

পিসিমার পরিকল্পনাও প্রায় সফল হয়ে এসেছে। অম্বির জন্য যে পাত্র সংগ্রহ করেছেন পিসিমা, সেই পাত্রের পক্ষ হতে পাতি-পত্র রচনা করার প্রস্তাবও এসে গেল। নইলে অন্য জায়গায় পাত্রী খুঁজবেন তাঁরা। পিসিমাও ব্যস্তভাবে উপেন আর চারুবালাকে নানা তাগিদে বিচলিত ক'রে তুললেন। পিসিমার কথার জালে তাঁদের মনের প্রশ্নগুলিও যেন বাঁধা পড়ে যাচ্ছে। ভুল হয়ে যাচ্ছে যুক্তি। পিসিমার কথার উপর বড় বেশি বিশ্বাস। পিসিমাকে বড়ই উপকারী জন বলে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন দুজনে। পাত্রপক্ষের লোক আর উপেনবাবু একদিন পাতি-পত্রে সিঁদুরের ছাপ দিয়ে বিয়ের প্রস্তাবও পাকা ক'রে ফেললেন।

আর একটা প্রস্তাব, পিসিমা তাঁর সংকল্পের আর এক পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। এইবার, অধীরকে স্পষ্ট ক'রে জিজ্ঞাসা করবেন, এবং বলবেন। রমার সঙ্গে অধীরের বিয়ের তারিখটা ঠিক ক'রে ফেলতে হবে, শুধু অধীরকে একটু জিজ্ঞাসা করা। শুধু দুজনের মন একটু বুঝে নেওয়া। রমার কি ইচ্ছে, পরীক্ষার আগেই রাজী কি না? অধীরও কি তাই চায়?

এইজন্যই একবার রমাকে বাড়িতে নিয়ে যাবেন পিসিমা। ছুটিতে এক সঙ্গে বসে গল্প করলে বলেই ফেলবে মনের কথা, আর পিসিমা আড়াল থেকে শুনেই ফেলবেন। পিসিমা বলেন,—ওগো আমি তো দিদিমা-হই, নাতির সঙ্গে একটু রগড় আমি করবো না তো কে করবে?

কদিন পরে পিসিমা নিজেই এলেন ছুটি চিঠি হাতে নিয়ে, ছুটি নিমন্ত্রণ পত্র। রমা আর অম্বির কাছে লেখা অধীরের ছুটি চিঠি। জন্মদিনের নিমন্ত্রণ। পিসিমা উপেনের বাড়ির ফটকে ঢুকবার আগেই একটি চিঠিকে কুচিকুচি ক'বে ছিঁড়ে ফেলেন। অম্বির নামে লেখা নিমন্ত্রণের আহ্বানলিপি ধুলোর উপর লুটিয়ে পড়ে থাকে। পিসিমা এসে শুধু রমার হাতে তুলে দেন নিমন্ত্রণ-পত্র।

দেখে খুশী হয় অম্বি। শুধু রমার কাছেই অধীরের নিমন্ত্রণের চিঠি এসেছে। আব মনে সন্দেহ থাকে না। অধীরের মনে রমার জন্য যে আহ্বান জেগে উঠেছে, তাব প্রমাণ ঐ নিমন্ত্রণের চিঠি। শুধু বমারই কাছে, আব কাবও কাছে নয়। চোখের জলে আর বিস্ময়ে এই প্রমাণকে সত্য বলে স্বীকার কবতে চেষ্টা করে অম্বি।

আব কোন প্রশ্ন নেই। অম্বির আর একটি মানতও সফল হয়েছে। অধীরের মন আজ রমাকেই খুঁজছে।

ভালো হলো, আপ্পি আব আম্মির জীবনের একটা সাধের আশাকে ব্যথিত কববার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেল অম্বির জীবন। আরও ভাল, অম্বিকে একটা ছলনা, একটা মিথ্যা ভালবাসার খেয়াল, একটা ফাঁকিব কুহকিনী বলে বুঝে ফেলতে পেরেছে অধীর। সুখী হোক অধীব। অম্বিকে মনে প্রাণে যদি ঘৃণা করতে পারে অধীর, তবেই একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারে অম্বি।

চোখের কোণ দুটো ছলছল করে, নিঃশ্বাসের মধ্যে যেন কাঁটা খচখচ করে, করুক। কেউ দেখতে পারে না, বেশ ভাল ক'রে এই বেদনা লুকিয়ে ফেলতে পারবে অম্বি। রমার বিয়ের দিনে অম্বির মুখের হাসি দেখে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় সন্দেহবাদীও ধরতে পারবে না যে, অম্বির বুকের ভিতর তার জীবনের সব চেয়ে প্রিয় স্বপ্নটা নিজেই নিজের গলায় ছুরি দিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আপ্পি আম্মি আর রমা সুখী হবে। সব চেয়ে বেশি সুখের কথা, অধীর সুখী হবে। তবে আর দুঃখ করবার কি আছে? অম্বি জানে, সেই পাঁচ বছর বয়স থেকেই জানে, কেমন ক'রে সংসারের এক একটা সুন্দর ও মধুর মায়া আর ভালবাসার লোভ থেকে নিজেকে টেনে নিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে হয়। সেই যে কবে, আজও স্মৃতির কুয়াশার ভিতর যেন জ্বলজ্বল করে সেই দৃশ্যটা। আম্মির বিছানা থেকে অম্বি তার ছোট বালিশটা তুলে নিয়ে আয়ার ঘরে চলে গেল। আম্মির বুক ঘেঁষে শোবার অধিকার ছিল না, সেই পাঁচ বছরের বয়সের অম্বির। আজও ঠিক তেমনিই সরে যেতে হলো। সহ্য করা এমন কি কঠিন কাজ? এখন তো অনেক বড় হয়েছে অম্বি। অনেক বয়স হয়েছে, বুকের হাড়গুলি কেমন যেন পাথর-পাথর হয়ে গিয়েছে।

রমাকে সাজিয়ে দিল অম্বি। সেই সাজে, যে-সাজে অধীরের স্বপ্ন অম্বিকেই সাজাতে চেয়েছিল একদিন। সেই চন্দ্রমল্লিকা, হাস্নুহানার সৌরভ, খয়েরের টিপ, আর চাঁপা রঙের শাড়ি। রমা আশ্চর্য হয়, কেন অম্বি যাবে না? চারুবালাই রমার আপত্তি খণ্ডন করেন, রমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এসে বলে দেন—বনেদী বংশের উঁচু জাতের বাড়িতে অম্বি যেতে পারে না, যাওয়া উচিত নয়।

পিসিমার বাড়িতে এই ঘটনার মীমাংসা হয়ে গেল বড় স্পষ্ট ভাবেই। রমা এল। অধীরের সঙ্গে নিভৃতে বসে রমার অনেক

গল্প আর আলোচনাও হলো। পিসিমা বার বার দরজার আড়ালে এসে দাঁড়ান, উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন। তারপরেই অপ্রসন্ন মুখে গজগজ করতে করতে অন্যত্র চলে যান। আবার ফিরে এসে শুনবার চেষ্টা করেন, কি বলছে অধীর রমাকে ?

শুনে হতাশ হয়ে পড়েন পিসিমা। অম্বি, অম্বি, অম্বি। শুধু অম্বির কথাই আলোচনা করছে দুজনে। রমাই বলে দেয়, অম্বি নিজের হাতে এভাবে সাজিয়ে দিয়েছে রমাকে। শুনে মনে মনে হাসে অধীর। অম্বির নানা গুণের কথা প্রাণ খুলে বলতে থাকে রমা। আর অধীরও অম্বির নামে সব গল্প আর সব ঘটনার বর্ণনাকে যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত শুনতে থাকে।

অধীর বলে—অম্বি বোধ হয় নিজেকে খুব চালাক মনে করে।

রমা—বোধ হয় কেন, সত্যিই অম্বির ধারণা যে, ওর চেয়ে জ্ঞানী ব্যাক্তি ভূ-ভারতে নেই। সর্বদা আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন অথচ নিজে……।

অধীর—নিজে কারও সামান্য একটা অনুরোধের সম্মান রাখতেও রাজী নয়।

বলতে বলতে গম্ভীর হয় অধীরের মুখ। তারপর রমার মুখের দিকেই যেন একটা বেদনাহত দৃষ্টি তুলে বলতে থাকে—তোমাকে বলা উচিত নয়, তবু না বলে থাকতে পারছি না, আমি আশা করেছিলাম, আজ অন্তত অম্বি আসবেই।

রমা বলে—আমিও আশ্চর্য হয়েছি। তা ছাড়া আমারও মনটা এত রেগে গেল যে আমিও ওকে আসবার জন্য বললাম না।

অধীর—তোমার তবু একটা সুবিধা আছে রমা, অম্বির ওপর রাগ করতে পার। কিন্তু আমি যে অম্বির ওপর রাগই করতে পারছি না।

খিলখিল করে হেসে ওঠে রমা। অধীর বলে—তুমি বোধ হয় আমাকে ঠাট্টা করছো রমা।

রমা বলে—হ্যাঁ, আপনাকে ঠাট্টা করাই উচিত। একথাটা আমাকে না বলে অম্বির কাছে বলে ফেললেই তো পারেন।

আড়াল থেকে শুনে চমকে ওঠেন পিসিমা। হ্যাঁ, অম্বি নামে ঐ অজাত একটা মেয়ে বড় বেশি ছলনা বিস্তার করেছে। ঐ মেয়েটাই পথের কাঁটা। ওকে পথ থেকে তাড়াতাড়ি সরাতে না পারলে পিসিমার সংকল্প ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। নিজেকে আরও কঠোর ক'রে, এবং চক্রান্ত আরও কঠোর ক'রে নিয়ে প্রস্তুত হন পিসিমা। অধীরের মন থেকেই অম্বির নামের মোহ চূর্ণ করে দিতে হবে।

রমার মুখের নানা গল্প শুনে নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছে অধীর। এতদিনে অম্বির ইচ্ছার চক্রান্তটাকে চিনতে পেরেছে অধীর। রমাকে নিজের হাতে সাজিয়ে অধীরের চোখের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে অম্বি তার মনের গোপন একটা চেষ্টাকেই ধরা পড়িয়ে দিয়েছে। অম্বির ইচ্ছা, রমার সঙ্গে অধীরের বিয়ে হোক, এই রহস্যের আভাস এক দুঃসহ বিস্ময়ের আঘাতের মত অনুভব করেছে অধীর। কিন্তু কেন? ভালবাসা কি এই রকম একটা লুকোচুরি খেলার আবেগ? খামখেয়ালের উল্লাস? অধীরের জীবনের আশা আর আনন্দগুলি কি অম্বির ইচ্ছার হুকুম মেনে উঠবে বসবে আর ছুটে বেড়াবে? এই বিস্ময়ের চরম হিসাব নিকাশ করবার জন্যই উপেনের বাড়িতে দেখা দিল অধীর।

অধীরকে দেখতে পেয়েই ভয় পায় অম্বি। অধীরের চোখে যেন দুর্জেয় একটা প্রশ্ন জ্বলজ্বল করছে। এবং সেই প্রশ্ন ধ্বনিত হওয়া মাত্র বুঝতে পারে অম্বি, তার শেষ প্রয়াস সফল হয় নি। রমাও একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছে অম্বিকে।

অধীর বলে—আমি তো আর দেরী করতে পারি না।

অম্বি বলে—ভুল করবেন না। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না।

—কেন ?

অম্বি বলে—আপনার ক্ষতি হবে।

অধীর—কিসে আমার ক্ষতি হয় বা না হয়, সেটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি আমার আছে।

বাগানের কাছে বাঁশের খুঁটি বেয়ে নতুন মাধবীলতা অনেক উপরে উঠে গিয়েছে আর নতুন বর্ষার জলো বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে তুলছে। এ হেন একটা ভয়ানক নিরালার এক কোণে অম্বি আজ অধীরের চোখের সামনে আটক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চলে যাবার সুযোগ পায় নি। বাড়ির ভিতর থেকেও কোন ডাক আসে না, কেউ ডাকলেও এখান থেকে শুনতে পাওয়া যাবে না। ছুতো ক'রে সরে যাবার উপায় নেই অম্বির। অধীরের মুখের ঐ স্পষ্ট দাবি যেন পরোয়ানার মত অম্বির কানের কাছে এসে অম্বিকে এই মুহূর্তে তৈরী হয়ে নিতে বলছে।

অম্বি বলে—আপনাকে আমার চেয়ে অনেক বেশি শ্রদ্ধা করতে পারবে, এমন মেয়ে কি এই পৃথিবীতে নেই ?

অধীর—থাকতে পারে!

অম্বি—আমার উপর মায়া করতে আপনার যতটুকু ভাল লাগছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ভাল লাগবে, এমন মেয়েও তো কত আছে।

অধীর চেঁচিয়ে ওঠে—না, নেই। আমি তোমার চেয়ে বেশি বোকা নই অম্বি।

উপায় নেই। কোন যুক্তি, কোন অনুরোধ কোন অজুহাত আর কোন ছলনার জোরে অম্বির প্রাণ অধীরের ঐ প্রতিজ্ঞার দাবিকে ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে আর মিথ্যা বুঝিয়ে পালিয়ে যাবার পথ পাচ্ছে না।

কিন্তু, আর এই সব তুচ্ছ বাজে যুক্তি আর তর্কের দরকার কি ? একটি সত্য কথা বলে দিয়েই তো এই মুহূর্তে অধীরের মনের এই প্রতিজ্ঞার জোর চূর্ণ ক'রে দেওয়া যায়। উঁচু জাতের এতবড় বংশ-গর্বের মানুষ যে এখনও অম্বির এই শরীরটার রক্তমাংসের ইতিহাসের কোন খবরই রাখে না।

হঠাৎ অম্বির চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে ওঠে। অধীরের মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে, যেন বুকের ভিতর মস্ত একটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য প্রস্তুত হতে চেষ্টা করছে অম্বি। অম্বি বলে—আপনি তো জানেন, কত বড় বংশের কত উঁচু জাতের মানুষ আপনি ?

অধীর—জানি বৈ কি।

অম্বি—আপনি তো জানেন যে, পৃথিবীতে আপনার চেয়ে অনেক নীচ জাতের মানুষ আছে।

অধীর—জানি।

অম্বি—নীচ জাতের মানুষের মনও নীচ হয়ে থাকে। বিশ্বাস করেন নিশ্চয়ই ?

অধীর—বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। অবিশ্বাস কববার জন্যই প্রমাণ খুঁজছি।

কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ নীরব হয় অম্বি। থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে অম্বির দুই কালো চোখের তারা। আর, চোখের কঠোর দৃষ্টি যেন হঠাৎ বেদনায় ছলছল ক'রে ওঠে।

আশ্চর্য হয় অধীর—তুমি আজ আমাকে এসব প্রশ্ন করছো কেন অম্বি ?

উত্তর দেয় না অম্বি।

অধীর বলে—রমা বোধ হয় তোমাকে বলেছে যে, আমি জাত-পাতের মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্য রিসার্চ করছি।

তবু উত্তর দেয় না অম্বি। মাধবীলতার ভেজা পাতা থেকে

টুপটাপ ক'রে জলের ফোঁটা অম্বির খোঁপার উপর ঝরে পড়তে থাকে। অধীরের মুগ্ধ চোখ ছুটো হঠাৎ এক নতুন সন্দেহে যেন তীব্র হয়ে চমকে ওঠে।—তুমি, তুমি কি তোমার নিজের জাতের কথা ভাবছো অম্বি ?

অম্বি—হ্যাঁ।

অধীর—তুমি কি উপেনবাবুর মত···মানে আমাদের মত জাতের মেয়ে নও ?

অম্বি—না।

অধীরের এতক্ষণের সব আগ্রহ যেন স্তব্ধ হয়ে আসছে। আস্তে আস্তে অতি শান্ত স্বরে, যেন ছোট একটি বিস্মিত আর্তনাদের মত শব্দ ক'রে অধীর প্রশ্ন করে—তবে ?

অপলক চোখে অধীরের মুখের দিকে তাকিয়ে অম্বির প্রাণটাও যেন নিজেকেই ধিক্কার দিয়ে শিউরে ওঠে। ভয় পেয়েছে অধীর। উঁচু জাতের মানুষের ভালবাসা হঠাৎ নীচ জাতের ছায়া দেখে আর্তনাদ ক'রে উঠেছে। ভালই হয়েছে। এই মুহূর্তে অধীরকে সব ভুল মোহ থেকে মুক্ত ক'রে দিতে পারবে অম্বি।

অধীরের মনকে হঠাৎ আঘাতে যেন চরম ক'রে চূর্ণ করার জন্যই নিজের পরিচয় প্রকাশ করে দেয় অম্বি।—আমি ভয়ানক ছোট জাত। আমি অন্ত্যজা, অস্পৃশ্যা। আমার রক্তে দোষ আছে, আপনাদের পবিত্র পৃথিবীতে আমি একটা আবর্জনা।

অধীর নিঃশব্দে স্থির হয়ে শুনতে থাকে। কিন্তু বিস্মিত হয়ে দেখতে পায় অম্বি, একি ? অধীরের ছুই চোখ যেন মুগ্ধ হয়ে উঠেছে। যেন এই জগতের এক বিস্ময়কে, এবং অধীরের জীবনের এক অন্বেষণের সত্যকে এতদিনে চোখের সামনে দেখতে পেয়েছে অধীর।

অধীর হাসে—তুমি ভয় দেখাচ্ছ অম্বি, কিন্তু ভুল করছো, তুমি আমার জীবনের সব অন্বেষণের জয়গান গাইছ। সত্য বলে বুঝতে

চেয়েছিলাম যে কথাকে, তুমি তারই রূপ, তারই প্রমাণ। তুমিই আমার বিশ্বাস, আমার থিওরীর শেষ অধ্যায় আজ আমি লিখবো। আমার জিজ্ঞাসার তৃপ্তি তুমি। সব চেয়ে বড় বেদনার শান্তি তুমি। তুমি ভুলভাঙ্গানো এক সুন্দর সত্যের মূর্তি। জাত মিথ্যা, রক্ত মিথ্যা—তোমার মধ্যেই তার প্রমাণ পেলাম।

আরও লুব্ধ ও মুগ্ধ হয়ে উঠেছে অধীরের অন্তরাত্মা। কিন্তু একেবারে অসহায়ের মত নীরব হয়ে যায় অম্বি। অধীরের এই প্রেমিকতা যেন স্বর্গের সুধার চেয়ে বেশি মধুর। কিন্তু এই প্রেম অম্বিকে আহ্বান করছে, আপ্পি আর আম্মির মনে দুঃখের আঘাত হানবার এক চক্রান্তে। মরতে পারে অম্বি, কিন্তু আপ্পি আর আম্মির কাছে হীন হতে পারে না। এই বাড়ির মায়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না অম্বি। এই সহজ সত্যটুকু বুঝতে পারছে না অধীর।

অম্বি বলে—না। তবু আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না।

অধীর—তবুও না?

কি আশ্চর্য! অম্বির এই পাথুরে হৃদয়ের পরিচয় কোনদিন পায়নি অধীর। এ যে পাথরের ফুল। কিন্তু কিসের আশায়, কোন্ মোহে, অধীরের এই আহ্বানকে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দেবার শক্তি পাচ্ছে অম্বি? এ কোন্ রহস্য?

অধীর প্রশ্ন করে—কোথায় কার কাছে কোন্ আকর্ষণের লোভে আমার ডাক এমন ক'রে তুচ্ছ করতে পারছো অম্বি? এর কি কোন গোপন কারণ আছে?

অম্বি বলে—আছে, তোমার প্রতি আমি নিষ্ঠুরতা করতে পারি, এমন কারণও আছে, আকর্ষণও আছে, লোভও আছে।

উত্তপ্ত স্বরে অধীর প্রশ্ন করে—শুনি, কি সেই আকর্ষণ?

অম্বি—শুনতে চাইবেন না, পায়ে পড়ি আপনার। আপনি

শুধু বিশ্বাস করুন, আপনার স্বপ্নের চন্দ্রমল্লিকা মরে গিয়েছে।

ক্ষীণ সন্দেহ নিয়ে ফিরে যায় অধীর।

অধীরের মনের এই অবস্থারই সুযোগ নিলেন পিসিমা। কথা-প্রসঙ্গে, আভাসে জানিয়ে দিলেন,—একটা ভাল খবর শুনেছিস অধীর? বেশ ভাল ঘরে অম্বির বিয়ে হচ্ছে। পাত্র বেশ পয়সা-ওয়ালা মানুষ।

চমকে ওঠে অধীর, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু দিদি-মাকেও অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। বিচলিত অধীরের যুক্তি বুদ্ধিও যেন এই দুঃসহ সংবাদে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। মনটাই সন্দেহের বশে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। অম্বির সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া করবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে অধীরের মন। টেলিফোনের রিসিভার তুলে ধরে অধীর।

অধারের ভাষাও যেন হঠাৎ তিক্ততায় উন্মত্ত হয়ে গরলে পরিণত হয়েছে। অম্বিকে স্পষ্ট করেই নিষ্ঠুর অভিযোগে আক্রমণ করতে কুণ্ঠিত হয় না অধীর।—এমন তামাসার, এমন হীনতার কোন প্রয়োজন ছিল না। টাকা আমার আছে, চাইলেই পাবে। এখনও পেতে পার। কিন্তু টাকার কাছে বিকিয়ে যায় কারা? তুমি কনকধুতুরা, বিষ আছে তোমার ঐ সুন্দর হাসিতে আর নিঃশ্বাসে; তুমি আমার সারা জীবনের বিশ্বাসের সাধনাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিলে। আজ আমাকে নতুন ক'রে লিখতে হবে, শুরু করতে হবে আবার—বলতে হবে পৃথিবীকে, জাত আছে, ছোট-জাত। তাদের রক্তে ছোটতা আছে। তার প্রমাণ তুমি।

অম্বির ক্ষীণ প্রতিবাদের ভাষা অধীর শুনতে পায় না! কল্পনাও করতে পারে না অধীর, তার কথার আঘাতে এখন দূর ব্যারাক-

পুরের একটি কক্ষের নিভৃতে অম্বি নামে এক মেয়ের দু'চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

অধীর বলে—কিসের আকর্ষণ? সে আকর্ষণ কি এতই সুন্দর যে তার জন্য তোমার কাছে আমার জীবনের সব অনুরোধ মিথ্যে হয়ে গেল?

অম্বি—তবে শোন।

কিন্তু অম্বির আবেদন শুনতে পায় না অধীর। টেলিফোন রেখে দিয়েছে অধীর। বার বার প্রশ্ন করেও উত্তর পায় না অম্বি।

চিঠি লেখে অম্বি।—তোমাকে সুখী করবার শক্তি আমার নেই, কারণ আমি চিরকাল আমার আপ্পি আর আম্মির গা ঘেঁসে পড়ে থাকতে চাই। এই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় লোভ। কিন্তু তুমি আমাকে সুখী করতে পার। আমাকে যদি সুখী করতে চাও, তবে রমাকে বিয়ে কর।

রমাকে বিয়ে কর! অম্বির চিঠির এই প্রস্তাব শুনে বিস্মিত হয় না অধীর। বিশ্বাসঘাতিকারা এই রকম আত্মত্যাগের ছলনা দেখায়। কিন্তু বুঝতে পারে না অম্বির যুক্তিগুলি। চিরকাল আপ্পি আর আম্মির গা ঘেঁষে পড়ে থাকবার আনন্দটুকু হারাতে চাই না। এ কথার অর্থ কি? তবে অম্বি কি বিয়ে করতে চায় না? তবে দিদিমা এ কোন্ কথা বললেন?

নিজেকে শান্ত ক'রে নিয়ে টেলিফোনেই আবার অম্বিকে ডাকে অধীর।... এবং পরমুহূর্তে সেই দুঃসহ সন্দেহের চরম মীমাংসা হয়ে যায়।

—আমার বিয়ে? অম্বি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ।

—কোথায়, কবে, কার সঙ্গে?

—বেশ এক টাকাওয়ালার সঙ্গে।

—কোথায় শুনলে?

—ভাল মুখ থেকেই শুনেছি।

—তবে শোন, কিন্তু একটি কথা দাও।

—কি ?

—এমন বিয়ের লগ্নের আগে তুমি একবার আসবে আমার চোখের কাছে।

—কেন ?

—এই পৃথিবীকেই একটা ঘটনা দেখিয়ে দেব।

—কি ?

—তোমার পায়ের ধূলোর দাগ এই সিঁথিতে বরণ ক'রে নিয়ে তোমার চোখের সামনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়বে এই ছোটজাতের মেয়ে, আর উঠবে না।

—অম্বি। অম্বি।

কোন উত্তর পায় না অধীর। কিন্তু অধীরের বুকে যেন তীক্ষ্ণ একটা আক্ষেপের খোঁচা লেগেছে। কি কুৎসিত সন্দেহ! কি ভয়ানক মূঢ়তা! নিজের ভুলের বেদনা সহ্য ক'রতে না পেরে ছটফট ক'রে বেড়ায় অধীর। বার বার অম্বির চিঠির সেই লাইনটাই পড়ে, 'আমাকে যদি সুখী করতে চাও, তবে রমাকে বিয়ে কর।'

বার বার এই লাইনটিই পড়ে অধীর। হেসে ওঠে অধীরের চোখ। চিৎকার ক'রে ডাক দেয় অধীর—দিদিমা!

বটার মা'র সঙ্গে কথা বলছিলেন পিসিমা। রমার সঙ্গে অধীরের আসন্ন বিয়ের শুভ ঘটনার সম্ভাবনার কথা আলোচনা করছিলেন। একটু আগেই দেখেছেন পিসিমা, উপেনের বাড়ির চাকর রামু এসে একটা চিঠি দিয়ে গিয়েছে অধীরকে ; আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন পিসিমা। ধারণা করেছেন, রমার চিঠি এসেছে। পিসিমাই যে ক'দিন আগে রমাকে আড়ালে ডেকে ফিসফিস ক'রে শিখিয়ে দিয়ে এসেছেন, তুমি বাছা মাঝে মাঝে অধীরকে চিঠি দিয়ো, দুটো ভাল কথা লিখে নেমন্তন্ন করো। জানই তো, আজকালকার শিক্ষিত

ছেলে, ওসব বড়ই ভালবাসে।

আশার আলো দেখতে পেয়েছেন পিসিমা। বটার মাকে বলেন—ঠিক, আমি যা ভাবছি তাই হয়েছে বটার মা। ভগবান বুঝি এতদিনে কৃপা করলেন।

পিসিমা অধীরের কাছে এসে খুশিভরা কণ্ঠে বলেন—কি রে ভাই ?

অধীর—তুমি কি চাও যে, আমি বিয়ে করি ?

—নিশ্চয়ই।

—তবে শোন।

পিসিমা এইবার যেদিন আসবেন সেদিন একেবারে শুভ সংবাদ সঙ্গে নিয়েই আসবেন। উপেন আর চারুকে এই আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন পিসিমা। আর দেরি করা উচিত নয়। কিন্তু অধীরের সম্মতির কথা নিয়ে কবে আসবেন পিসিমা, এই কথাই উৎসাহিত-ভাবে আলোচনা করেন উপেন আর চারুবালা। এবং হঠাৎ সচকিত হয়ে দেখতে পেলেন, সত্যিই পিসিমা আসছেন। অধীরও সঙ্গে আছে।

রমার পড়ার ঘরের ভিতরে গিয়ে বসে থাকে অধীর, পিসিমা ধীরে ধীরে গম্ভীর মূর্তি নিয়ে উপেনের কাছে এগিয়ে আসেন।

উপেন বলেন—পিসিমাকে স্মরণ করা মাত্র যখন পিসিমা উপস্থিত হয়েছেন, তখন বুঝতে পেরেছি, নিশ্চয়ই শুভ সংবাদ আছে।

তিক্ত ও কঠিন মুখ নিয়ে পিসিমা বলেন—হ্যাঁ। শুভ সংবাদ। আমাকে যখন ঠাকুর ঘরে ঢুকে বলতে হয়েছে···।

—কি ?

—বলিয়ে ছেড়েছে গো। অধীরের বিয়ের কথা ঠাকুরকে নিবেদন করতে হয়েছে। ঠাকুরের কৃপা চাইতে হয়েছে। চাইয়ে

ছেড়েছে গো।

উপেন আর চারুবালা উৎসাহিত হয়ে হাসতে থাকেন। কিন্তু পিসিমার চোখ হতাশ উদাস ও বিষণ্ণ। পিসিমা হাঁপ ছেড়ে বলেন—অধীর বিয়ে করবে বলেছে।

চারু—দিনক্ষণের কথা ?

পিসিমা—তা জানি না, একটা দিন হলেই হলো।

চারু—পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই ভাল ছিল।

পিসিমা—কিসের পরীক্ষা ?

চারু—রমার।

পিসিমা—রমার পরীক্ষা রমা দিক না কেন। অম্বির তো পরীক্ষা-টরীক্ষা নেই।

চারু চেঁচিয়ে ওঠেন—তার মানে ? অম্বি ? অম্বি মানে কি ?

পিসিমা আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন—অম্বিকেই তো বিয়ে করতে চায় অধীর।

পিসিমার কথা শোনামাত্র নিস্তব্ধ হয়ে আর শূন্য দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন উপেন আর চারুবালা। পিসিমাকেই এক অদ্ভুত বিশ্বাসঘাতিকার মত মনে হয়। কিন্তু দেখা যায়, ভীতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন পিসিমা।

চারুবালা বলেন—কিন্তু অধীর যদি জানে যে অম্বির জাতটা কি, তাহলে নিশ্চয়···।

পিসিমা বলেন—সে কি আর জানতে কিছু বাকি আছে। সবই জানে। যার জানাবার সেই জানিয়ে দিয়েছে। অদ্ভুত ! অধীর কি বলে শুনবে ? বলে, অম্বি তো এখন উপেনবাবুরই মেয়ে।

উপেন—তবে আপনার আর কি জানবার আছে ?

পিসিমা—আমার কিছুই জানবার নেই। নাতি শুধু জানতে চায়, অম্বি রাজী আছে কি না।

চারুবালা ধিক্কারের সুরে চেঁচিয়ে ওঠেন—ওর রাজী হতে কি

আর বাকি আছে না কি ? জেনে শুনে ইচ্ছে করেই এই কাণ্ড করেছে। রাজী হয়েই আছে।

পিসিমা—তবু একবার অম্বিকে জিজ্ঞেস ক'রে অধীরকে তোমরাই জানিয়ে দিও। আমি আর এর মধ্যে নেই।···আর এই নাও···।

অম্বির বিয়ের সেই পাতি-পত্র উপেনের হাতের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে পিসিমা চলে গেলেন, পৃথিবীকে ধিক্কার দিতে দিতে, সংসারের অদ্ভুত অনিয়মগুলিকে অভিশাপ দিতে দিতে।

বাইরের বারান্দায় গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন পিসিমা। চুপ ক'রে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর কাঁদলেন। পিসিমার মনের রাজ্যেও যেন একটা ওলট-পালট হয়ে গেল হঠাৎ।

শ্যামবাজারের বাড়িতে আর ফিরবেন না পিসিমা। তাঁর নিজের মনের হীনতাকেও আজ যেন দেখতে পেয়েছেন পিসিমা। তাই নিজেকেই অশুচি বোধ করছেন।

মনে পড়ে পিসিমার, অধীরের সেই কথাগুলি, তোমার কোম্পানির কাগজগুলি কাড়তে চাই না, কিন্তু তোমার আশীর্বাদ কাড়তে চাই।

আবার ফিরে আসেন পিসিমা। নিস্তব্ধ উপেন আর চারুবালার কাছে এসে একটি কাগজের প্যাকেট সঁপে দিয়ে বলেন,—এগুলি তোমাদের কাছেই রাখ।

উপেন আতঙ্কিতের মত তাকান—কেন ? পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ, এসব কার জন্য ?

পিসিমা—অম্বিকে দিয়ে গেলাম। যখন হার মেনেছি, তখন ভাল করেই হেরে যেতে চাই। আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। আমি এখন কাশী যাব, তারপর কোথায় যাব জানি না।

চলে গেলেন পিসিমা।

এবাড়ির অন্তরে যেন এক ভয়ংকর পরাভবের অপমান রেখে দিয়ে পিসিমা সরে পড়লেন। বিস্মিত ও আতঙ্কিত হয়ে শুধু সহ্য করবার চেষ্টা করেন উপেন ও চারুবালা। এ কি কাণ্ড? কোন্ নিয়ম? রমাকে পছন্দ না ক'রে অম্বিকে পছন্দ করে, এ কোন্ প্রেমের চক্ষু? শিক্ষিত উচ্চবংশীয় অধীর শিক্ষা দেখল না, বংশও দেখলো না! রূপও দেখলো না। তবে দেখলো কি?

প্রথমে অধীরের কথা আলোচনা করেন। অধীরের উপর শুধু অভিমানের মত একটা অভিযোগ ব্যথা দেয় চারুবালাকে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারেন, অধীরের দোষ নয়। দোষ যার, অলক্ষ্যে দংশন দান ক'রে এই বাড়ির এতদিনের স্নেহের শোধ দিল যে সাপিনী, সে-ই এখন মনের উল্লাস লুকিয়ে ঐ ঘরে বসে রয়েছে। পরের মেয়ে, একটা অজাতের মেয়ে এইভাবে এতদিনে কৃতজ্ঞতার শোধ দিল। আড়াল থেকে ছলনার জোরে একটা ভাল ছেলের মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। রমা পারবে কেন ঐ সাপিনীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায়? বড় জাত আর ছোট জাতের পার্থক্যই এই।

কি আশ্চর্য! বলতে বলতে উপেন ছটফট করেন। যেন এই সর্বনাশটুকু করবার জন্যই ধীর স্থির শান্ত অথচ হীন একটা হিংসা, একটা বাচ্চা মেয়ের মূর্তি ধরে এই পরিবারের বুকের কাছে দেখা দিয়েছিল। বাইশ বছর ধরে বড় হয়ে, এতদিনে তৃপ্ত হয়েছে সেই হিংসা। তাদের নিজের মেয়েকে পৃথিবীর কাছে ছোট ক'রে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে সেই হিংসাটা।

—মেয়ের মত নয়। সাপের মত। চিৎকার ক'রে ওঠেন চারুবালা।

—ভুল হয়েছে। চেঁচিয়ে ওঠেন উপেন।

তারপরেই নিজেকে সংযত ক'রে উপেন বলেন—যাক্, আর দেরি করা উচিত নয়। অম্বিকে জানিয়ে দাও, জিজ্ঞাসা ক'রে নাও,

তার পর নিঃশব্দে বিদায় ক'রে দাও। আমাদের আর চিৎকার ক'রে লাভ কি ?

কিন্তু চিৎকার ক'রে ওঠেন চারুবালা।—কিন্তু আমাকে বাদ দাও। ও মেয়েকে চেলির জোড়ে সাজিয়ে দিয়ে আমি উৎসব করতে পারবো না। আমার হাতে মঙ্গল-ঘট সাজানো চলবে না। আমি উলু দিতে পারবো না, আমি আশীর্বাদ করতে পারবো না। আমি ফিরে এসে যেন দেখতে পাই, তুমি এই সাপের মতকে বিদায় ক'রে দিয়েছো।

ঘর থেকে ছুটে বের হলেন চারুবালা। কিন্তু অম্বি শুনতে পেয়েছে আম্মির আক্ষেপের কঠোর ভাষাগুলি। শুনে চমকে উঠেছে।

ছুটে আসে অম্বি। এবং চারুবালাকে ছুটে যেতে দেখেই বাধা দিয়ে ডাক দেয় অম্বি—আম্মি।

—চুপ! চুপ। আমি কারও আম্মি নই। সাপের মত তুই, রক্তে বিষ আছে তোর।

ছুটে যান চারুবালা। অম্বি আর্তনাদ ক'রে পিছু পিছু ছুটে যায়—আম্মি। আম্মি।

কিন্তু সর্বনেশে এক আঘাতের বেদনায় তীক্ষ্ণ স্বরে অম্বির গলা যেন হঠাৎ ছিঁড়ে যায়। ভাঙ্গা সিঁড়ি থেকে নীচে পড়ে গিয়েছেন চারুবালা। ছুটে আসে রমা আর উপেন আর অধীর।

অচেতন ও দুর্বল অসাড় দেহ নিয়ে বিছানার উপর পড়ে ছিলেন চারুবালা।

অধীরের টেলিফোনের ডাক শুনে ছুটে এসেছেন অধীরের ডাক্তার বন্ধু। মাথায় আঘাত পেয়েছেন চারুবালা। ডাক্তার বলেন—রক্ত চাই। 'বি' টাইপ রক্ত।

কিন্তু চাইলেই, এবং টাকা খরচ করতে তৈরী হলেও রক্ত পাওয়ার আশা ছেড়ে দিতে হলো। ডাক্তারের টেলিফোনের জিজ্ঞাসার উত্তরে রক্তব্যাঙ্ক সংক্ষেপে দুঃখ প্রকাশ ক'রে জানিয়ে দেয়, 'স্টক'এ এখন সব টাইপের রক্ত নেই। 'এ' আছে 'এ-বি' আছে, আর 'ও' আছে। 'বি' একেবারেই নেই। চিন্তায় পড়লেন ডাক্তার। চলে গেলেন, এবং ফিরে এলেন রক্ত আহরণ ও সঞ্চার করবার যন্ত্রসম্ভার সঙ্গে নিয়ে।

আর দেরী করলে চলবে না। এই মুহূর্তে রক্ত সঞ্চার করতে হবে চারুবালার দেহে। ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। রক্ত দেবার জন্য উপেন এগিয়ে আসেন। ডাক্তার আপত্তির ভঙ্গীতে বলেন, আপনি বুড়ো মানুষ, আর কেউ নেই ?

কিন্তু উপেনের অনুরোধে রক্তের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা ক'রেই বলেন--চলবে না।

রমা এগিয়ে আসে। রমার রক্তের নমুনা পরীক্ষা ক'রে দেখে মন্তব্য করেন—চলবে না। আর কেউ নেই ? দেরি করলে চলবে না। কুইক।

অম্বি এগিয়ে আসতেই উপেন চমকে উঠে বাধা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অম্বি বাধা মানে না। অম্বির দুই চক্ষুর কঠোর দৃষ্টি দেখে উপেন হঠাৎ কুণ্ঠিতভাবে চোখ ঘুরিয়ে নেন।

অম্বির দেহের উপরেই ডাক্তারের শোণিতগ্রাহী যন্ত্র পিপাসিতের মত মুখ এগিয়ে দেয়। রক্তের নমুনা পরীক্ষা ক'রে খুশী হয়ে ওঠে ডাক্তারের চক্ষু। মিল, মিল পাওয়া গিয়েছে। এই তো, সুন্দর 'বি' টাইপ রক্ত। অম্বির রক্তের কণিকা চারুবালারই রক্তের কণি-কার মত একই মায়ার উত্তাপ দিয়ে গড়া।

অম্বির মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বলেন—সুন্দর মিলে গেছে। চলবে। কিন্তু আপনার শরীরও যে দুর্বল মনে হচ্ছে। অনেকখানি রক্ত টানতে হবে, ভয় করছে না তো ?

অম্বি বলে—আপনি আর একটুও দেরি করবেন না ডাক্তারবাবু।

কি আশ্চর্য, অম্বির সারা মুখে কি-যেন এক পরম তৃপ্তির আনন্দ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

অম্বির দেহ থেকে রক্তধারা আহরণ করেন ডাক্তার। তারপর অন্য ঘরে গিয়ে সংজ্ঞাহীন চারুবালার দেহে রক্ত সঞ্চার করেন। সমাপ্ত হয় ডাক্তারের কাজ।

যাবার সময় খুশী হয়ে বলে যান ডাক্তার।—আর আশঙ্কা কববার কিছু নেই।

ধীরে ধীরে চেতনা লাভ করেন চারুবালা। উপেন বলেন—এ কি রকম ব্যাপার হলো? এ কেমন রক্তের মিল?

অধীর—আপনি কি আশ্চর্য হয়েছেন?

উপেন—হ্যাঁ, আমার সঙ্গে মেলে না, রমার সঙ্গে মিললো না, মিললো গিয়ে··।

অধীর মৃদু হাসি হাসে।—আপনি কি মনে করেন, রক্তের মধ্যে জাত আছে?

চারুবালা হঠাৎ চোখ মেলে তাকান—কি বলছো তোমরা?

অধীর বলে—আচ্ছা, আমি এবার আসি।

আস্তে আস্তে হেঁটে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যায় অধীর।

চারুবালা—কি কথা বলছিল অধীর।

উপেন বলেন—অধীর নয়, আমিই বলছিলাম। আবার একটা অপমান সইতে হলো চারু।

—কি? কে অপমান করলো?

—অম্বি। অম্বির রক্তের মধ্যে ডাক্তার তোমার রক্তের মিল খুঁজে পেয়েছে।

কি? অম্বি রক্ত দিয়েছে? উত্তেজিত হয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করেন চারুবালা।

উপেন—হ্যাঁ।

চারু—কেন ?

উপেন—কেন জানি না। জানে অম্বি, জানেন তোমার ভগবান, জানে এই সংসারের যত অদ্ভুত অনাসৃষ্টির নিয়মকানুন। শুধু তুমি জান না, আর আমি জানি না।

অবসন্নের মত আবার বিছানায় লুটিয়ে পড়েন চারুবালা। চারুবালার চোখ ছলছল করে।

উপেন বলেন—হার হলো, সব দিক দিয়ে। হার হলো চারু। অম্বি দেনা শোধ ক'রে দিল, আর ওকে বলবার কিছু নেই, ওর কথা ভুলে যাও।

চারুবালা বলেন—হ্যাঁ, ভুলেই যেতে চাই।

যেন নরম হয়ে আসছে চারুবালার মনের কঠোর বিক্ষোভগুলি। চারুবালা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা স্বরে বলতে থাকেন—দোষ মেয়েটার নয়, দোষ আমাদের ভাগ্যের। এমনই হয়ে থাকে। দয়া ক'রে আমাকে বাঁচিয়েছে অম্বি, ওর ওপর রাগ করবার অধিকারও রইল না।

হঠাৎ প্রশ্ন করেন চারুবালা—অম্বি কোথায় ?

—ঐ ঘরে। ডাকবো ?

—না। তুমি জিজ্ঞাসা করে এস।

—কি ?

—আর কি চায় অম্বি ? আমাদের জব্দ করবার আর কোন শখ যদি থাকে মনে, বলে ফেলুক এখনি।

উপেন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন।—দেখ, আর কোন কথা বলাই উচিত নয়। শুধু যেটুকু কর্তব্য আছে, তাই কর।

চারু—জিজ্ঞাসা করে এস, কবে বিদায় নিতে চায়। তারপর অধীরকে জানিয়ে দাও।

যাবার আগে অম্বির বিছানার কাছেই এসে একবার দাঁড়ায় অধীর। অবসন্নভাবে যেন একটা তন্দ্রা চোখে নিয়ে শুয়ে আছে অম্বি। অম্বিকে প্রশ্ন করে অধীর—কি ব্যাপার?

অম্বি—আমার নিঃশ্বাসে বিষ আছে অধীরবাবু, আমি বিশ্বাস করি। আর আমার সবচেয়ে বড় অপরাধ কি জানেন, আমি এখনও বেঁচে আছি।

অধীর—এ কথার অর্থ?

অম্বি—আমিই আম্মির এই কষ্টের কারণ। আপনি পিসিমাকে বৃথাই পাঠিয়েছেন, আমি বিয়ে করবো না।

অধীর—তাহলে আমাকে তোমার আর বলবার কিছু নেই?

অম্বি—আছে।

অধীর—বল।

অম্বি—আমাকে ঘেন্না ক'রে চলে যান, আর আপনি সুখী হোন।

অধীর—চলে যাচ্ছি, কিন্তু দুঃখ এই যে, তোমাকে ঘেন্না করে যেতে পারলাম না। আমি তোমাকে ভালবেসে ভুল করিনি, কিন্তু তুমি আমাকে ভালবেসে ভুল করেছো।

অম্বি—হ্যাঁ, ভুল ক'রে ভালবেসেছি অধীরবাবু, বুঝতে পারিনি।

অধীর হাসে।—তুমি নিশ্চিন্ত হও অম্বি, দুঃখ করো না, তোমার সেই ভুলের কথা ভেবেই আমি সুখী হতে পারবো। এ ছাড়া সুখী হবার আর কোন পথ নেই।

অম্বি দুহাতে চোখ ঢাকা দিয়ে বলে—ভুলে যাও।

উত্তর না পেয়ে আরও ব্যাকুল হয়ে অম্বি বলতে থাকে।—তুমি সুখী হবে, রমাকে বিয়ে কর। আমার কথা রাখ।

অম্বির চিঠিকে দুমড়ে মুচড়ে অম্বির বিছানার উপর ফেলে দেয় অধীর।—এই অনুরোধ ক'রে বৃথা আমাকে অপমান করো না অম্বি। রমা বেচারাকে ঠকাবার পরামর্শ আমাকে দিও না। তার চেয়ে ভাল, আমিই জীবনে ঠকে যাই।

চলে যায় অধীর। কিন্তু অম্বি বুঝতে পারে না যে অধীর চলে গিয়েছে। অম্বি বলে—কিন্তু আমাকে ক্ষমা করে যাও। আপ্পি আর আম্মির মুখের হাসি নষ্ট করতে পারবো না আমি, আমার এই দুর্বলতা ক্ষমা কর।

দরজা পর্যন্ত এসেই থমকে দাঁড়ান এবং শুনে চমকে ওঠেন উপেন। এ কি? কার সঙ্গে কথা বলছে অম্বি?

শুনতে থাকেন উপেন, অধীরের পায়ের শব্দ হনহন ক'রে বাইরের বারান্দার উপর দিয়ে যেন ছুটে চলে যাচ্ছে।

বাইরের অন্ধকার থেকে একটা দমকা বাতাস ঘরে এসে ঢোকে। ফরফর ক'রে দুমড়ানো একটা চিঠি ঘরের ভিতর থেকে উড়ে এসে উপেনের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে।

চমকে ওঠেন উপেন। চিঠি পড়েন উপেন। চিঠির ভাষা বলেছে—তুমি ভুল করো না, রমাকে বিয়ে কর, তাহলেই আমি সুখী হবো।

পড়েই বিস্ময়ের অপলক চক্ষু নিয়ে তাকিয়ে থাকেন এবং পর-মুহূর্তে ঘর ছেড়ে চলে গিয়ে উপেন চেঁচিয়ে ওঠেন—হেরেছি চারু, সত্যিই হেরে গিয়েছি। অম্বির কাছে আমাদের জীবনের সব ভুলের অহংকার হার মেনেছে।

চিঠি পড়েন, উঠে বসেন, এব চোখ বন্ধ করেন চারুবালা।

উপেন বিচলিত হয়ে বলেন—বল চারু, একি মেয়ের মত একটা প্রাণের কথা, না মেয়ের চেয়েও···।

চারুবালা—দেখ এখন, স্বীকার কর, যাকে মেয়ে বলে মানতে ভয় করেছিলে, সে-ই তোমার মেয়ের চেয়েও··· ।

উপেন ব্যাকুলভাবে বলতে থাকেন—হার মেনেছি চারু। হার মানতেও বড় আনন্দ হচ্ছে, অম্বি আমাদের ফাঁকি ধরিয়ে দিয়েছে। অম্বি! অম্বি!

উপেন ছটফট করতে করতে অম্বির ঘরের দরজার কাছে এসে

দাঁড়ান, তারপর ডাক দেন—আয়। একবার কোনমতে কষ্ট ক'রে তোর আম্মির কাছে আয় অম্বি।

অপরাধিনীর মতো ধীরে-ধীরে এগিয়ে এসে চারুবালার বিছানার কাছে দাঁড়ায় অম্বি। চারুবালার চোখ দুটো ঝকঝক করে। অপলক চোখে অম্বির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তার পরেই হঠাৎ, জলে ভেজা রোদের মত এক ঝলক স্নিগ্ধ হাসির আভা ফুটে ওঠে চারুবালার চোখ-মুখ জুড়ে যেন থম-থম করতে থাকে। চারু বলেন—অধীর তোকে বিয়ে করতে চায়? তুই রাজী আছিস তো?

অম্বি বলে—না।

—কেন?

—আমি বিয়ে করতে চাই না।

—কেন?

—রমার বিয়ে হোক্।

—কিন্তু তোবও তো বিয়ে হওয়া চাই।

—না চাই না। আমি যে তোমাদের ··।

—বল, চুপ কবে রইলি কেন! বল, তুই আমাদের কে?

কেঁদে ফেলে অম্বি - আমি যে তোমাদেব ছেলের মত, চিরকাল তোমাদের কাছেই থাকতে চাই। আমি চলে গেলে তোমাদের দেখবে কে বল?

বেদনাভরা লজ্জাব আঘাতে আহত হয়ে চমকে ওঠেন চারুবালা ও উপেন।

উপেন বলেন—আমাদের অনেক ভুল হয়েছে অম্বি, কিন্তু তুইও এখন ভুল করছিস। বিয়ে তোকে করতেই হবে, এবং অধীরের সঙ্গেই বিয়ে হবে।

—কেন আপ্পি?

উপেন—কেন আবার কি? আমরা হাসতে চাই, আবার

কাঁদতেও চাই! তোকে সুখী করতে চাই, আবার তোকে ছেড়ে দেবার দুঃখে কষ্ট পেতেও চাই। তুই তো বুঝবি না, এ কেমন দুঃখ। তুই যে আমাদেরই…।

—আপ্পি! চেঁচিয়ে ওঠে অম্বি। উপেনের মুখের দিকে জল-ভরা দুই চক্ষুর দৃষ্টি নিয়ে যেন বিদ্রোহিণীর ভঙ্গী ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি। যেন শেষ বোঝাপড়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে অম্বির সমস্ত অন্তর। উপেনের মুখের ঐ ভাষাকে সহ্য হয় না। হাত দিয়ে উপেনের মুখ চেপে ধরে অম্বি—বলো না আপ্পি, আর ওকথা বলো না। সহ্য করতে পারবো না।

চারুবালা--শোন অম্বি।

অম্বি—না, শুনতে পারবো না।

উপেন—আরে, তুই যে আমাদেরই মেয়ে।

শুনে শিউরে ওঠে, তারপরেই যেন স্তব্ধ হয়ে উপেনের মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে অম্বি। তারপরেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে চারুবালার পিঠের উপর মুখ লুকোয় অম্বি, গুনগুন ক'রে কাঁদতে থাকে। সারা জীবন উৎকর্ণ হয়ে ছিল অম্বির প্রাণ যে সত্যের ঘোষণা শোনবার জন্য, এতদিনে এই অদ্ভুত এক লগ্নে সেই সত্যের ধ্বনি শুনতে পেল অম্বি। মেয়ের মত নয়, আমাদেরই মেয়ে। আঃ, সারা জীবনের একটা অভিমানের জ্বালা জুড়িয়ে গেল।

চারুবালা অনুযোগ করেন - ছিঃ, এ কি করছিস অম্বি? সব মেয়েরেই বিয়ে হয়, আর বাপ-মাকে ছেড়ে থাকতেও হয়।

অকস্মাৎ রমা বিস্মিত চক্ষু নিয়ে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করে- একি? অম্বি কাঁদছে কেন?

চারুবালা হাসেন—বিয়ের কথা শুনে কাঁদছে।

রমা আশ্চর্য হয়—বিয়ে? কার বিয়ে?

চারু—অম্বির।

রমা—কার সঙ্গে ?

চারু—অধীরের সঙ্গে।

ঝক্ ক'রে হেসে ওঠে,রমার কৌতুকদীপ্ত দুই চক্ষু। রমা বলে—তোমরা বিশ্বাস করেছো বুঝি, অম্বি কাঁদছে ?

চারুবালা বলেন—চুপ কর তুই।

রমা—আমি বলছি হাসছে, নিশ্চয়ই হাসছে।

এগিয়ে এসে জোর করে অম্বির মুখ তুলে ধরে রমা। হ্যাঁ, অম্বির চোখ সত্যিই জলভরা; কিন্তু তারই মধ্যে দেখা যায়, অম্বির দুই ঠোঁটে যেন এক কৃতার্থ জীবনের হাসি সলজ্জ আভাস দিয়ে ফুটে উঠেছে। যেন একটা শিশুর কচি মুখের হাসি; যেন বহুদূর হতে ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বাপ-মা'র কোলের কাছে লুটিয়ে পড়েছে, আর সেই আনন্দ সইতে না পেরে হেসে উঠেছে।

অম্বির মুখের দিকে বড় বড় চোখ ক'রে তাকিয়ে রমা হাসে—আমি আগেই জানতাম।